থিয়েটার : মাইনোরিটি কালচার!

তীর্থঙ্কর চন্দ

নাট্যচর্চার সাম্প্রতিক সমস্যা

বহু সক্ষম নাট্যব্যক্তিত্বের কথাবার্তা, লেখা, আলোচনা বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে এটা এখন প্রায় একটি প্রতিষ্ঠিত মত যে, দূরদর্শন এবং আরও সব প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন প্রচার মাধ্যমের দাপটে নাট্যচর্চার একেবারে নাভিশ্বাস উঠে গেছে। লোকজন আর নাটক দেখতে আসেন না। এবং সেটা শুধু এ রাজ্যে বা এ দেশে নয়, বাইরের বিভিন্ন দেশে ঘুরে এসেও নাট্যব্যক্তিত্বরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ওই একই পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন। নাটকে দর্শকের অভাব। আর বেশ কিছু পরিণাম দর্শক ছাড়া নাট্যের ভবিষ্যত যে অন্ধকার একথাও সত্য। তাহলে উপায়টা কী? সে ও বলেছেন যোগ্যজনেরা, কেউ কেউ সেই পথের চর্চাও শুরু করেছেন। দর্শকের অনাগ্রহ কাটাতে, তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী, নাট্যপ্রযোজনাকে অনেক বেশি অর্থালঙ্কারে সাজিয়ে তুলে উপস্থিত করতে হবে দর্শকের সামনে। এবং ব্যবহার করতে হবে প্রযুক্তির একেবারে আধুনিকতম সব উপকরণ। অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে সক্ষমতম প্রতিষ্ঠিত সব ব্যক্তিত্বদের প্রাধান্য দিতে হবে, তাঁরা বিভিন্ন দল থেকে সংগৃহীত হতে পারেন, নিয়ে আসা হতে পারে দূরদর্শন বা চলচ্চিত্রজগৎ থেকেও। অর্থাৎ অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমগুলির সঙ্গে এক তীব্র প্রতিযোগিতায় নাট্যকে এইভাবে প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নামতে হবে। অবশ্য করেই প্রচার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একইরকম গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা হবে। চেষ্টা করা হবে, প্রয়োজনাটিতে চরিত্রসংখ্যাও যেন যথেষ্ট কম রাখা যায়। তাহলে একই দলের প্রধান কয়েকজনকে দিয়ে অথবা মাত্র দুচারজনকে বাইরে থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেই কাজ সারা যাবে। কল্ শো-এর ক্ষেত্রে যাতায়াত খরচ ইত্যাদিও অনেক কম পড়বে। ফলে, দলের ইন্‌ভেস্টমেন্ট থাকবে তুলনামূলকভাবে সামর্থের মধ্যে।

এখন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা নাট্যচর্চার চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকেও যেসব তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরতা দেখা গিয়েছিল, তার থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ - ষাট বছরে অনেকটা যে সরে আসা হয়েছে, এটা স্পষ্ট। সেসব নিয়েও আলোচনা হতে পারে এবং হবেও। কিন্তু ওই সময়কার প্রভাবে প্রভাবান্বিত স্বকথিত বর্তমান উত্তরাধিকারিরাও যখন এখনকার চর্চাপদ্ধতি হিসাবে নবতর সব পথ বাতলে দেন, অনুসরণ করেন, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে এর পেছনেও কিছু বাস্তবতা অবশ্যই রয়েছে। কারণ নাট্যচর্চাকারিরা তো সত্যিই চান যে তাঁদের প্রয়োজনগুলি জমে যাক, মানুষজনের সেইসব প্রযোজনা দেখুক, প্রশংসায় বা সঠিক সমালোচনায় পরের প্রযোজনাটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। এ তো তাঁদের এক স্বাভাবিক অবশ্য প্রার্থনা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমশ তাঁদের এক অন্য বেলাভূমিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতসব করেও কিন্তু কোথায় যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। অর্থ, অভিনেতাদের প্রাচুর্যেও হলঘর ফাঁকা! পাঁচ দশটি শো-এর পরেই প্রত্যেকটি শো-এর আনুষঙ্গিক খরচ সামলাতে হচ্ছে দলের ফান্ড থেকে। আবার কখনও এমনও হচ্ছে, কোনো কোনো প্রযোজনায় প্রচুর দর্শক আসছেন কিন্তু কেন আসছেন, সেটা ব্যখ্যা করা, ধরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। এ তো গেল প্রযোজনার কথা। দল পরিচালনার ক্ষেত্রেও যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেবার কথা গোড়ায় প্রাধান্য পেত, আজ ক্রমশ সেখানে এক ধরনের মার্জিত অটোক্রাসি-র চর্চা সুস্পষ্ট। এবং দলের মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের বক্তব্য অনুযায়ী, এ ছাড়া অন্যতর চর্চা অসম্ভব। এ তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অতি মূল্যবান ম্যাক্সিম্। কিন্তু বাস্তব এই, নবতর সব পথ পদ্ধতি অবলম্বন করেও কিন্তু আর শেষ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর ওটাও হয়ত ঠিক, আর্ট-এর ক্ষেত্রে সবকিছু একেবারে অঙ্কের হিসাব ধরে চলে না, সমস্তকিছুকে রসায়ন বিদ্যার সূত্রের অনুসরণে মিশিয়ে চাওয়ার জিনিসটি সহজে বানিয়ে তোলা যায়। শিল্পের ভবিষ্যত বা বিচার কোনোটাই একেবারের সহজ সরল পথ ধরে হাঁটে না। ওটা অনেক জটিল এবং হয়ত অজ্ঞাতও বটে! তবু চলতে চলতে কিছু প্রাসঙ্গিক কথাও জমা হতে থাকে।

আজ থেকে দেড় দুই শতাব্দী আগেও মানুষের মন এবং মনের চিকিৎসা বিষয়টিকে অনেকাংশেই তল পাবার মত নয় বলে প্রচার করা হতো। মানুষের ভাবনাচিন্তা, সঠিক বেঠিক সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং আচরণ, মানুষ যে হঠাৎ কখন কী অবস্থায় চলে যায়, যেতে পারে, সে সাধারণের চিন্তারও বাইরে। অতল - এর সাক্ষাৎ পেয়েও তাকে চিনতে পারা যায় না, হৃদয় অলকানন্দার জলে ভেসে যায় আজীবন। কিন্তু কাব্য আর বিজ্ঞানের মূলগত তফাৎকে অনুসরণ করেই কবির যেখানে বিহ্বল হয়ে থাকা, বিজ্ঞানীর সেখানেই নির্মোহ অনুসন্ধানের শুরু। মনোবিদরা এই মন এবং মস্তিস্ক-র নানাবিধ কার্য লক্ষ্য করে দীর্ঘদিন তার কারণ অনুসন্ধানে নিবিষ্ট থেকেছেন। প্রযুক্তির অগ্রগতি বিজ্ঞানচর্চাকে সাহায্য করেছে নানাদিক থেকে, তথ্য আহরণ করা হয়েছে সেখান থেকেও। মনোবিজ্ঞান আজ একটি 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ কিছু সূত্র কিছু কার্যকারণ সম্পর্ক মনের সেই অতল-এর হদিশ দেয়, দিতে পারে। অবশ্যই বহু অংশ অনালোকিত এখনও। বলাবাহুল্য, এই সূত্রেরই উল্টোপিঠে বিস্তীর্ণ স্পষ্ট স্বচ্ছভাগের অবস্থানও নির্দিষ্ট। এমনকী, একজন লেখক যখন লেখেন তখন তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ভেতর দিয়েও তাঁর মনোজগতের, মানসিক গঠনটির অনুসন্ধান চলে, লেখাটি কাদের কাছে পৌঁছনোর জন্য তাঁর ব্যগ্রতা এবং লেখার তলায় তলায় যে বয়ে চলেছে অন্য

একটি লেখার প্রবাহ, চর্চাকারিরা শুধু তার আন্দাজ নয়, খুঁজে বার করে আনছেন সেইসব তথ্য। ফলে আর্ট-এর বিমূর্ততার পেছনেও যে কিছু স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা থাকে, অনুসন্ধান চলেছে তারও। অন্যদিকে, একক নির্মাণের যেসব ক্ষেত্র যেমন কবিতা বা পেন্টিং, সেসবের প্রকাশ, বিবর্তন ইতিহাস ইত্যাদি থেকে নাট্যের— যাকে সম্মিলিত নির্মাণের উদাহরণ হিসাবে ধরা হয়, তার প্রকাশ, তার বিবর্তন ইতিহাসের একটা গুণগত পার্থক্য থাকবেই। অবশ্য বহু সমাজতাত্ত্বিক স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, সব সৃষ্টিই মূলত সম্মেলক বা সামাজিক, এককের প্রকাশ - নৈপুণ্যেরও পেছনে থাকে বহু প্রয়াস, শ্রম এবং মনন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভাবনার কথা অপ্রধান হয়ে যায় কখনো কখনো, উঠে আসে অন্য তত্ত্ব, তার থেকে নির্দিষ্ট হয় অন্য সূত্র, অন্য চর্চা পদ্ধতি ইত্যাদি। এখন আমরা চেষ্টা করবো আমাদের এখনকার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যাকে প্রবল বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, অন্যদিক থেকে আলো ফেলে সেগুলোর প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান করা যায় কিনা! বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে, হয়ত প্রসাধনে সামন্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সমস্যার মূল কাঠামোটি দীর্ঘদিন ধরে প্রায় একই বলে নির্দিষ্ট এবং নিরাময়ের ওষধি হিসাবেও যা সব নিদান, সেসবের ক্ষেত্রেও আরও বিস্তারিত সমাজ - অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। সেসব যে একেবারেই কোনোসময় বলা-কওয়া হয়নি, তা নয়, তবে নানা বাস্তব কারণে আমরা সেসবকে পরশপাথরের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি। অতীত বিস্মৃত শ্রমবিমুখ জাতি আমরা, আবার পেছনের পথে হেঁটে গিয়ে সেইসব মণিমুক্তা সংগ্রহে চূড়ান্ত অনীহা আমাদের! বরং সমস্যা নিয়ে নানা কথা বলে আমরা যে বাস্তব সংলগ্ন সেটাই প্রমাণের চেষ্টা করি এবং একই সঙ্গে সমাধানের বহু পরীক্ষিত ভুল পথে হেঁটে চলি। এই চলা-য় 'বহু'-র পদধ্বনি আছে, 'স্বাধীন' হয়ে পড়ার ভয়ে আশঙ্কিতও হতে হয় না। কিন্তু নিজেদের যে কোনো কাজের পথপদ্ধতি, নির্মাণের উদ্দেশ্য— এ সব কিছুই নির্ভর করে যে সময়ে আমাদের অবস্থান, সেই পরিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব একটা স্পষ্ট স্বচ্ছ ধারণার ওপর।

নাট্যের সেমিওটিক্স

Semiotics can be defined as a science decicated to the study of production of meaning in society. As such it is equally concerned with the process of signification and with those of communication i.e. the means where by meanings are both generated and exchanged.

নাট্যজগতে এই সেমিওটিক্স বিজ্ঞানটির প্রবেশ খুব বেশিদিনের নয়। ভাষাতাত্ত্বিক স্যসুর যেভাবে দেখালেন sing as a tow - faced entity linking a material vechile or signifier sith a mental concept or signified—অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় বা concept (signified) আপ সেই বিষয়ের বাহক অর্থা? যা সব কিছুর ভেত দিয়ে চিন্তক সেটা পৌঁছতে চান, এই দুই মিলিয়েই সংযোগ— নাট্যে এই সংযোগই একটি প্রাত্যহিক জীবন্ত কেন্দ্রিয় উপাদান। প্রযোজনার অঙ্গনে যা যা, বাস্তবতায় তার সেই অবস্থান বা গুণ না থাকলেও সেটা একটা বিশেষ অথত বহন করতে পারে, করে। এমনকী, একন অভিনেতাকেও বলা হচ্ছে, 'the dynamic unity of an entire set of signs. In traditional dramatic performance the actors body acquires its mimetic and representational power by becoming something other than itself, more or less than individual.' ফলে মঞ্চের প্রত্যেকটি ব্যবহৃত উপাদান, অভিনেতাকে ধরেই, নানাভাবে দর্শকের কাছে কিছু বার্তা পৌঁছে দেয়। একটি সম্মেলক গাথার সৃষ্টি হয়। এই গাথাকাব্যে একটি টেবিল শুধুমাত্র একটি চার পা - ওয়ালা কোনো বস্তু রাখার স্থান না, এর বাইরেও তার ভেতর দিয়ে অনেক বারতা পৌঁছনোর সম্ভাবনা থাকে — আমারা কোথায় তাকে কীভাবে রাখছি, ব্যবহার করছি, তার নির্মাণেও সচেতনভাবে কোনো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে দিচ্ছি কিনা— এসবই বিবেচ্য বিষয়। আলো মঞ্চ আবহ ইত্যাদিরা এইভাবে নিজগুণেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে শুধু নির্মাতার জাদুকাঠি স্পর্শের অপেক্ষা। এইসবকিছুকে সংহত করে এনে স্রষ্টা তাঁর আত্মগত একটি বাসনাকে সামনের দর্শকের কাছে মেলে ধরেন। এখন এই মেলে ধরার কাজটি শিশুপাঠ্য নীতিকথামালা ছোট্ট একটি গল্পের মধ্য দিয়ে যেভাবে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো — যেমন, মিথ্যা কথা ভারি বিপদ কিংবা ক্ষুদ্র হলেও তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়— নাট্যের চাওয়াটি মূলতঃ তাই হলেও এ চলন সভ্যতার এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। নাট্যের বিন্যাস অনেক বিস্তারিত, ঘটনাবহুল এবং অপ্রত্যক্ষ। ওই বিন্যাসের আবরণ সরিয়ে অপ্রত্যক্ষতাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে করতে দর্শক যখন এক বা একাধিক উপলব্ধিতে পৌঁছন তখন নির্মাতার সঙ্গে তিনি একটি মানসিক নৈকট্য অনুভব করেন, তৃপ্ত হন। বলা বাহুল্য, অনেক সময় স্রষ্টার উদ্দেশ্য বা নির্দিষ্টতাকে ছাপিয়ে বহু বারতা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় যা দর্শকের নির্দিষ্ট সমাজ মানসিক গঠনের উপর একান্ত নির্ভর করে। একই সঙ্গে দেখা এবং ভেতরে ভেতরে গভীরতর অনুসন্ধানের যে আনন্দ, শ্রম, দর্শকের সেটাই প্রাপ্তি, সেটাই তার বিনোদন উৎস। কোনো নির্মাণ যা দর্শকদের কোনো অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে না, কেবলমাত্র তাকে passive রেখে কিছু জিনিস দেখিয়ে যায়, তা কিন্তু দর্শকদের সমৃদ্ধ তো করেই না বরং ক্লান্ত— ক্লান্ত কবে। প্রত্যক্ষে ভেতর দিয়ে এক অপ্রত্যক্ষ অতলের অনুসন্ধান করা মানুষের গভীরতর প্রবৃত্তি, প্রত্যেকে সেই আকাঙ্ক্ষাই করে। দর্শকের মনোজগতের অবস্থান আর নির্মাতা কনসেপ্ট পৌঁছনোর যে সব মাধ্যম তার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয় দর্শকের

পরিতৃপ্তির পথ। এবং সম্ভবত, নাট্যসহ যে কোনো শিল্পের দুর্বোধ্যতার একটা সমস্যাও উঠে আসে এইখান থেকে।

দর্শক : একটি জনসমষ্টি!

যে সমাজটায় আমরা চলাফেরা করি, সেখানে 'আমরা' বলে শব্দটি ব্যবহার করা হলেও তার ভেতর বহু ভাগ উপভাগ রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। সমাজকে নানাভাবে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা দেখিয়েছেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সমাজে কী উৎপাদিত হচ্ছে, কীভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং সেই উৎপাদিত বস্তু সবার মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে কীভাবে— সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে এসবের উপর। এসব অনেক পুরোনো কথা, নানাভাবে বহুবার বলাও হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ বইটিতে সমাজতাত্ত্বিক জর্জ টনসন ওই উৎপাদনের পেছনকার শ্রমের ইতিহাস এবং এ থেকে নিষ্কাশিত বিনোদন প্রকাশগুলিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। শ্রমের সঙ্গে বিনোদন সম্পর্ক, চর্চিত রিচ্যুয়াল ইত্যাদির প্রকাশে স্বতন্ত্র একটি ব্যাখ্যাচিত্রও আমরা পাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার ব্রত বইটিতে। তাঁদের দুজনের ব্যাখ্যাতেই, উদাহরণে এটা স্পষ্ট যে পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তে দুটি জনগোষ্ঠী উৎপাদন পদ্ধতির সাযুজ্যে প্রায় একই ধরনের রিচ্যুয়াল, একই ধরনের বিনোদন প্রক্রিয়ার অভ্যাস করে থাকে। ঘর প্রাঙ্গন মন্ডপ সাজানোর যে চিত্রকরণ আলপনা তার ভেতরেও ফুটে ওঠে ওই জনগোষ্ঠীর যাপনচিত্র। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে মানুষদের প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশাপূরণ প্রক্রিয়া বিভিন্নরকমই হবে। আমরা দেখবো, নাট্যপ্রযোজনাতেও সেই ভিন্নতা সেই স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের সময় রঙ্গস্থলে যে জর্জরদণ্ড পুঁতে রাখা হতো সেটা ছিল অ-সংস্কৃত (!) অনার্যদের প্রতি এক স্থায়ী শাসন - প্রতীক। সংস্কৃত নাটকের ভাষা, মুদ্রার সঙ্গে ইত্যাদি বুঝতে অপারগ অনার্যরা নাট্যের রসাস্বাদনে বেগড়বাই করলেই— ওই চেয়ে দ্যাখ, বুঝিয়ে দেওয়া লাঠি!— অর্থাৎ যে উপায়ে যে প্রকাশে আর্যদের বিনোদন আশা মেটে, অসংস্কৃত অনার্যরা এসবের কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। ফলে অসন্তোষ এবং ওই জর্জর! বলা বাহুল্য, এখনও সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে। কেবল ওই জর্জর-এর প্রকাশ ও ব্যবহারবিধির রূপান্তর দেখা গেছে যুগে যুগে। কোম্পানীর আমলে যখন কোলকাতাকে কেন্দ্র এই দেশটাকে একেবারে লুঠে আয়োজন চলছে তখন ক্রমশঃ জন্ম নিচ্ছে এক শ্রেণীর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, সংখ্যায় তারা খুবই কম আর অন্যদিকে ভেঙে পড়ছে গ্রামে গাঁথা এই বাংলাদেশের সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো। বেঁচে থাকার তাগিদে কোলকাতাতে ভিড় করেছেন অভাবি গ্রামীণ মানুষেরা। ইংরেজদের সঙ্গে নানা ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে ওই মুৎসুদ্দিদের আচার আচরণ ইত্যাদির দ্রুত বদল ঘটছিল, একেবারে পার্থিব লাভালাভের ভিত্তিতেই যেন করজোড়ে কোম্পানীর সাহেবদের কৃপাপ্রার্থী হবার হুড়োহুড়ি লেগেছিল তখন। ওইসব উঠতি মুৎসুদ্দিদে বাড়িতে যেসব বিনোদন আয়োজন হত, সেখানে চারপাশে ভিড় করা কৌতূহলী সাধারণ মানুষদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। সেখানে সস্ত্রীক কোম্পানী বাহাদুর, তাদের অধস্তন কর্মচারী এবং গৃহস্বামীর সমঅর্থনৈতিক অবস্থানের ইয়ার - দোস্তরাই আমন্ত্রিত, আপ্যায়িত। যে আড়ম্বর যে বিপুল বৈভবের ভেতর দিয়ে কোলকাতার বাবুদের বিনোদন অভিলাষ মিটত, সেখানে সাধারণ মানুষেরা, যারা সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা শরীরে ও মনে ব্রাত্য হয়ে থাকবে, থাকতে বাধ্য—এটাই তো স্বাভাবিক। আঠারোশ ঊনত্রিশে মোকাম কলিকাতায় বাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজো এবং অনুষঙ্গিক আদো আহ্লাদে খরচ হয় পঞ্চাশ লাখ টাকা, পাঁঠা বলি হয় হাজারের উপর। ওই সময়েও ওই উৎসব অনুষ্ঠানে আমোদ আহ্লাদে বাবুরা 'বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থান করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি ব্যতিত দর্শনাকঙ্ক্ষী লোকদিগকে ভবনে প্রবেশ নিবারণ করেন। কিন্তু দ্বার সম্মুখবর্তী পথ হইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন।—' গাত্রে বেত্র এবং ওই সারজন সন্তরী সে তো জর্জরেরই নাগাল পাওয়া ইতিহাসের নবতম সংস্করণ।

এইরকম প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতি দ্বিখণ্ডনের বাইরেও একটা প্রচ্ছন্ন বিভাজন প্রক্রিয়া সমাজ কাঠামোর ভেতরেই রাখা থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার দিকে উঠতি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোম্পানী সাহেবদের মেলামেশা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়। আর এই মাতব্বর নেটিভ আর শাসককর্তা সাহেবদের মাখামাখি এমনই তুঙ্গে ওঠে যে অঠারোশ চল্লিশে কোম্পানী বাহাদুর দশ নম্বরী আইনের দ্বারা পূজায় যোগদান নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতেও নাচগান খানাপিনা লোভে দুর্গাপুজোয় সাহেবসুবোদের যোগদান একেবারে বন্ধ করা যায়নি। এখন এই যে মাখামাখি কাছাকাছি আসা তাতে শিক্ষার সুযোগে আচার ব্যবহারের বিশেষত বাঙালী 'জেন্টু'রা প্রভাবিত হতে থাকতো স্বাভাবিকভাবেই। এই শিক্ষিত হয়ে ওঠা যে প্রকৃতপক্ষে অর্থকরী দিক থেকে সক্ষম হয়ে ওঠারই প্রক্রিয়া সেকথা বলা বাহুল্য। ইংরেজদের হৌসে কাজ লইবার নিমিত্ত দ্রুত কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখে নেওয়া ছিল একটা প্রয়োজনীয় দস্তুর। প্রকৃত 'শিক্ষা' থেকে এইসব পদ্ধতি প্রক্রিয়ার অবস্থান ছিল শত হস্ত দূরে, বোঝাই যাচ্ছে। এমনকী, তখনকার প্রাইমারগুলি আলোচনায় অনেকেই দেখিয়েছেন যে কীভাবে বর্ণবৈষম্য, সামাজিক হায়াররিক তখনকার শিশুমনে চিরন্তন প্রশ্নাতীত সত্য হিসাবে চালানো হয়েছিল। সে স্বতন্ত্র দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছিল তাহলো বাংলাদেশের উঠতি বাবু এবং তাদের নিকট ও লতায়পাতায় জড়ানো আত্মীয়স্বজনদের চলাফেরা

আচারব্যবহার খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির ভেতর একটা স্বতন্ত্র ভাব গড়ে ওঠা। তাদের বিনোদন মাধ্যমেও সেই আরোপিত স্বাতন্ত্র্য তখনকার দিনে একটি বিশেষ জাঁক করার মতো বিষয়। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, নাট্যের বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিমায়ও একটা পশ্চিমী প্রভাব, এ দেশীয় সাধারণ মানুষদের কাছে যা অনেকটা অপরিচিত।, সেই চর্চারই সূচনা হতে থাকলো। ফলত, একদিকে, যে অর্থব্যয়ে ওইসব চর্চার দর্শক হওয়া হয়ে যাচ্ছিলো, সেটা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে, অন্যদিকে, নাট্যের যে বিষয়, প্রকাশ ভঙ্গিমার যে 'পরিশীলিত' অবস্থা সেসবও সাধারণের বোধের বাইরে। উৎপল দত্ত-র বহু আলোচিত বহু উদ্ধৃত টিনের তলোয়ার নাটকের একেবারে শুরুতেই কোলকাতার তলায় থাকা 'মথুর' এবং বেঙ্গল অপেরার পরিচালক কাপ্তেনবাবুর বাক্যালাপে এই সত্যই অত্যন্ত সরল ভঙ্গিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এমনকী, তখন বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চার পীঠভূমি ঠাকুরবাড়িতে নাটকের প্রযোজনাগুলি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে আপনা-আপনিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১২৮২ সালে যে বিদ্বজ্জন সভার জন্ম, যে সভার উপযোগী নাটক রচনার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর, লেখা হয় বাল্মিকী প্রতিভা— সেই সভার নাম, নাটকাভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র এবং ওই পত্র প্রবেশপত্র স্বরূপে দ্বারদেশে গৃহীত হইবার পদ্ধতি নাট্যরসাস্বাদনের জন্য কাঙ্খিত দর্শক চৌহদ্দীকে নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সামাজিক সম্পর্ক আমাদের এমন এক আচার অভ্যাসে বিনোদন চর্চা এবং সার্থকতা আকাঙ্ক্ষায় নিমজ্জিত করে রাখে যাতে মনে হয়, আমরা যা করছি, এটাই স্বাভাবিক, এটাই আমাদের আপন। নিজস্ব এই অবস্থান থেকেই আমরা আরও উৎকর্ষতার চর্চা শুরু করি। কিন্তু ওই শিক্ষায় ওই সামাজিক অবস্থান থেকে যারা অনেক দূরের, তাঁদের মননকে আমরা কোনোভাবেই ছুঁতে পারি না। এবং মজার কথা, আমরা অনেকেই ছুঁতে চাইও না কারণ ওই ছুঁতে না পারার ক্ষমতাটাই কখনও কখনও আমাদের সূক্ষ্মশিল্পচর্চার অনবদ্য বোধের প্রকাশ হিসাবেই বিবেচিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম আত্মতৃপ্ত চর্চাকারিদের ক্রমশ একটি বৃত্ত তৈরি হয়, তাঁদের প্রচেষ্টার পারস্পরিক প্রশংসা সমালোচনায় আসর পুরো সরগরম হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলির সঙ্গে স্বাতন্ত্র আছে বলেই নাট্যচর্চা কেবলমাত্র এই পারস্পরিক মুগ্ধতার চর্চায় বেঁচে থাকতে পারে না, ক্রমশ স্বখাত সলিলে সে নিমজ্জিত হতে থাকে। নাট্য অঙ্গনে প্রতিদিন বহু দর্শকের উপস্থিতি না থাকলে নাট্যের জীবনশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে বাধ্য। যাঁরা আসেন না বলে সন্দীপন ভিক্টর ব্যানার্জির বৈঠকখানার বাইরে বর্ধমানে চিত্রকলার প্রদর্শনীর প্রস্তাব দেন, যে জন্য নাটকের প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্বরা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ক্রমাগত কমে যাওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে থিয়েটার একটি মাইনরিটি কালচার নামক হাস্যকর তত্ত্ব হাজির করেন— এসবের পেছনে কিন্তু একটিই তাগিদ, প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে আরও বেশি মানুষকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। চিত্রকলার তবুও চলে, ফ্রেমটি ভবিষ্যতের জন্য থাকলো তুলে রাখা, নাট্যের চলে না। তার এখনই কিন্তু দর্শক চাই অনেক। এখন অবশ্য জর্জর পুঁতে রাখতে হয় না, প্রেক্ষাগৃহের দরজায় সারজনও নেই, প্রবেশপত্র কেনার কক্ষটিও সবার জন্য খোলা কিন্তু একটু নিরপেক্ষতা, একটু দূরবর্তী অবস্থান থেকে দেখলে বোঝা যায়, সেই প্রাচীনত্বের খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি, বহুর জন্য দরজা প্রকৃতপক্ষে বন্ধই থাকে। অবশ্য এমনিতে নাকি বোধভাষ্যিওয়ালা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও নাকি এখন অনেক বিস্তারিত! তবে একটি দেশের কত শতাংশ মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওই বোধের অধিকারি হয়েছে, প্রকৃতঅর্থে শিক্ষিত হওয়া এবং বোধসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়—এসব ওই মাইনরিটি কালচারের প্রবক্তারা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না সম্ভবত। গরিষ্ঠজন, সাধারণ মানুষ—এ সমস্ত টার্মস্ টার্মিনোলজি নিয়েও বিতর্ক বিস্তর। — কোনো কিছু সৃষ্টির সময় কেনই বা অতসব মনে রাখতে হবে, কী দায়! সাধারণ মানুষকে আদৌ মাথায় রাখা হবে, কি হবে না— এসব নিয়ে বহু আলোচনা বহু সেমিনার সভা ইত্যাদি উত্তপ্ত হয়। বহু গবেষণাপত্রের প্রকাশ ঘটে। ঠাণ্ডা ঘরে গম্ভীর আলোচনার জন্য দেশবিদেশের প্রতিনিধিরা উড়ে যান, উড়ে আসেন। এখন একথা ঠিকই, গ্রামীণ কৃষিজীবী, শহর মফস্বলে শ্রমিক, শিক্ষিত - অশিক্ষিত বেকার যুবক— এঁরা সব প্রচলিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে যক্ত থেকেও উৎপাদিত পণ্যের অংশ ভাগে তাঁরা বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করেন। সংস্কৃতির জগতেও তাঁদের নির্মাণ, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ভিন্নতর। একজন কৃষক অথবা খেতমজুর এবং একজন শহুরে কিংবা ছাঁটাই মজদুর— এঁদের অবস্থানগত ভিন্নতার দরুনই তাঁদের সংস্কৃতি— কেবল গান নাটক নয়, প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের ব্যবহৃত সব শব্দ, সম্বোধন, উপমা বাক্যবন্ধ—এসব পাল্টে পাল্টে যায়। এ যেন এক স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বদ্বীপ সমষ্টি। আর নাগরিক উচ্চ মধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তদের আলোকোজ্জ্বল শহরের অবসরকালিন বিনোদন, সে নাট্য চিত্রকলা চলচ্চিত্র কাব্য যাই হোক, তার চর্চা এবং প্রকাশ ওই বৃহদংশকে বাইরে রেখেই। অনেক স্রষ্টা সচেতনভাবে তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওই ওই বৃহদংশের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা নেন, সফলতার হিসাব এখানে গৌণ— তাঁরা চেষ্টা করেন এবং অবশ্যই তাঁরা মুষ্টিমেয়; অন্যদিকে, অনেকের কাছে এই গণ্ডীবদ্ধতাই আত্মশ্লাঘার, নিজেদের আসন খুঁজে নেবার উদ্দিষ্ট পথ।

আমাদের ঐতিহ্য : কোন কথা বলে প্রাণ

যাত্রাপালার গঠন, আমাদের গ্রামিণ প্রযোজনা ভঙ্গিমার স্বাতন্ত্রতা ইত্যাদিকে এই আলোচনার বাইরে রেখে

বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে কোলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় তার বেঁচে থাকার তাগিদেই দর্শকের পরিধিকে আরও অনেক বাড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র মুৎসুদ্দিদের, কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের জন্য নাট্যচর্চা —এই ধারণা বদলাতে শুরু করেছিল তখন। মনে রাখতে হবে, তখন কেবল প্রবল সম্পদের অধিকারী ওই উচ্চবিত্তরা নয়, কোলকাতায় তখন মধ্যবিত্তদেরও শ্রেণি হিসাবে একটা বেশ শক্তপোক্ত জমি তৈরি হচ্ছে। কেবলমাত্র নাটকের টেক্সট্গুলো মন দিয়ে পড়লেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের নাট্যভাষায় পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ার মতো। কিন্তু –তবুও—সংখ্যাগরিষ্ঠেরা ওই প্রেক্ষাগৃহের বাইরেই থেকে গিয়েছিলেন। সেটা প্রবেশ দক্ষিণার মূল্যমানের জন্যই হোক অথবা ভেতরের বিনোদন ভঙ্গিমার জন্যই হোক। শুধু কোলকাতার তলায় থাকা মজুর না, বাজারের আলু বিক্রি করে যে ময়না, যে হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে কাপ্তেনবাবুর বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভিনেত্রী এবং স্বধর্ম চ্যুতি ঘটবে যার— সে-ও, তারাও ওই টিনের তলোয়ার শোভিত নাট্যচর্চায় ব্রাত্যজন। একটা জিনিস লক্ষ্য করার, বঙ্গভঙ্গের সময় কোলকাতার নাট্যমঞ্চ যে সাড়া জাগিয়েছিল বিষয়গতভাবে, সেইসব নাট্যে স্বাদেশিকতার প্রচার ছিল স্বাভাবিকভাবেই প্রকট। প্রধানত ক্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বাদেশিকতার বান ডেকে গেল। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের প্রতিটি অভিনয়ে শত শত দর্শককে স্থানাভাবে ফিরে যেতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম', 'সিরাজদ্দৌল্লা,' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', উভয়ই বৃটিশরাজের আদেশে নিষিদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও আমাদের অতীত - বীরেরা এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন। কোলকাতার বাবু-সমাজ এই সব প্রচার নাট্যকে নিজেদের প্রযোজন অনুযায়ীই যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু এইখানে একটি প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। মেবার পতন কিংবা দুর্গাদাস নাটকের রচনাকার দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ভিন্ন ব্যাখ্যায় রাম এবং অহল্যাকে নিয়ে পাষাণী নাটক লেখেন, তখন সেটাই কোলকাতার কোনো প্রোফেস্যানাল বোর্ডে মঞ্চস্থ করা যায়নি। কোলকাতার বাবু সমাজ ওই মিথ্কে ভেঙে গড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। ঠিক এরকমই ঘটে দেশভাগোত্তর এদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল -এর সম্পর্কিত পৌত্র কেদারলাল রায়ের কুন্তী কর্ণ-কৃষ্ণা নাটকের ক্ষেত্রেও। ১৯৫৭ সালে এই নাটক নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা জনসভা করেন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে নাটকটি বন্ধ করে দিতে দাবী জানায়। সে নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা, শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি অন্য ইতিহাস কিন্তু যখনই নাট্যের বিষয় এমনকী নির্মাণ পদ্ধতিও সমাজ পরিচালকদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তখনই জনপ্রিয় নাটককার বা নাট্যকারকেও সমাজের রোষের মুখে পড়তে হয়। এই চিত্র পৃথিবীর সর্বত্র এক এবং অনাদিকালের। আর ঠিক এইজন্যই উপভোক্তাদের পরিধিতে সাধারণ গরিষ্ঠজনের প্রবেশ সমাজপতিদের বিশেষ দুশ্চিন্তা আর উষ্মার কারণ হয়ে ওঠে।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আঘাত করেছিলেন ঠিক এইখানটায়। আমরা কেবলই গণনাট্যের প্রয়োজনার বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি কিন্তু তাঁদের নাট্যনির্মাণ পদ্ধতিতেও যে অসামান্য সক্ষমতার প্রকাশ সেই ব্যাখ্যা প্রায়শই গৌন হয়ে যায় নাট্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের সাধ্যমতো শ্রমদান, প্রত্যেকের সম্মান ও স্বীকৃতিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া —সংঘ চর্চায় বোধহয় সবচেয়ে নজর করার মতো বিষয়। প্রসঙ্গত, তখন সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে আসা পিপলস্ থিয়েটার কিংবা ব্রিটেনে জোয়ান লিটিলউড্-এর থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদলের নাট্যবিষয় ও নাট্যচর্চা পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যকর্মীদের একই সঙ্গে প্রভাবিত করেছিল। আমরা অনেকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা-র বোধহীন সংঙ্কীর্ণ প্রচলনের জোরজবরদস্তিকে সমালোচনা করতে গিয়ে ওই বাস্তবতার দর্শনকেই নস্যাৎ করে দিয়েছি। নানা তত্ত্ব এবং ব্যাখ্যার মুন্সিয়ানায় যখন শিল্প কার জন্য এই প্রশ্নকে প্রায় অধরা বিমূর্ত একটা জায়গায় নিয়ে চলে যাওয়া হয় তখন ক্রমশ সেইপথ যে একসময় থিয়েটারের মাইনরিটি কালচার পর্বে এসে থামবে, এত বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে আমরা এই সময়ের নাট্যকর্মীরা কোনো নাটককার বা ঔপন্যাসিকের নাটক বা নাট্যবস্তু আহরণে যতটা সন্ধানী দৃষ্টি রাখি, দেশ-কাল সমাজ নিয়ে তাঁদের মতামত বা বক্তব্যকে গুরুত্ব দেবার সামান্যতম প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। উদাহরণ হিসাবে এ কথা হ্যারল্ড পিন্টার সম্পর্কেও যেমন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কেও তেমন। —যাকে বাঙালি সংস্কৃতি বলে ঢাক পেটানো হয় তা যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মপ্রবাহ ও জীবনযাপন থেকে প্রেরণা না নিতে পারে তো তাও অপসংস্কৃতির মতো উটকো ও ভিত্তিহীন হতে বাধ্য। তার বাইরের চেহারা যতই 'রুচিশীল' হোক, তাতে ঘষামাজাভাব যতই থাকুক, তা রক্তহীন হতে বাধ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের রক্তধারাকে ধারণ না-করে কোনো দেশের সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা কখনো প্রাণবন্ত হতে পারে না। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে আজ আমাদের সংস্কৃতি রুগ্নদেহ, তার দৃষ্টি ফ্যাকাশে তার স্বর ন্যাকা এবং নিশ্বাসে প্যানপ্যানানি। —ইলিয়াস- এর মতো একজন প্রাজ্ঞ মানুষের এই খেদোক্তির প্রতি আমাদের মাইনরিটি কালচারএর তাত্ত্বিকদের সহজে নজর পড়ে না বরং ইলিয়াস পুজোয় ব্যস্ত থেকেও এইসব কিছুকে সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

নাট্যচর্চা : মাইনোরিটির বন্দনা গান

এখন কেন এই পদ্ধতিটাই এইরকম চর্চাই সাম্প্রতিকালে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে, তারও একটা কার্যকারণ

সম্পর্ক সম্ভবত ধরে ফেলা যায়। এখনও যাঁরা বাংলা নাট্যজগতের সামনের সারিতে থাকা অগ্রজ ব্যক্তিত্ব তাঁদের বেশির ভাগই একসময় বামপন্থী চিন্তাভাবনার অংশীদার ছিলেন। এবং অন্তত খাতায় কলমে, এখনও তাই আছেনও। এই বামপন্থী মনন কেবল কোনো একটি বা দুটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিকের এক ধরনের বৈজ্ঞানিক মাসিকতায় ব্যাখ্যা করা নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান, শিল্পচর্চার বিষয় ও বিন্যাস নির্বাচনের একটা অভিমুখ তৈরি করে। পরবর্তীতে ঘাট-সত্তর দশকে যাঁদের জন্ম, এখন নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কাজের শুরুই আশির দশকের মাঝামাঝি অথবা শেষভাগ থেকে। তাঁদের অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই যেন বামপন্থার প্রতি আস্থা রেখেছেন, গণনাট্যের কাজকর্মকে — সেই দর্শনকে — বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। কিন্তু প্রতিদিনের সমাজের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ওই দর্শনকে নানাভাবে দেখা, আরও গভীরতায় গিয়ে অনুধাবন অনুসন্ধান করা সে আর তাঁদের পক্ষে হয়ে ওঠে না। এখন এই সত্তর পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় বামপন্থার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে যে কোনো ভাবে চিরস্থায়ী করে রাখতে তৎপর রাজনৈতিক চর্চাকারিরা বামপন্থার মূলগত দর্শনটিকে একেবারে দূরে অনালোচিত রেখে কেবল নানাধরনের পন্থাকেই প্রধান বলে মেনে নিয়েছে। ফলে স্থবিরত্ব এবং পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চাতুরীর চর্চাই একমাত্র প্র্যাক্টিস্। সাংস্কৃতিককর্মী অনুরাগী দরদীরাও স্বাভাবিকভাবেই এর শিকার। একেবারে খোদ গণনাট্য সংঘের ভেতরেও নিম্নমেধার বহু অনুগত মানুষজনই এখন বেশি সক্রিয়। অবশ্য এই ট্র্যাডিশন তো উৎপল দত্ত ঋত্বিক ঘটককে শাস্তিদানের প্রথা থেকেই চলেছে! আর সত্তর পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক সুযোগসুবিধা আদায় উদ্দেশ্যে আরও নিম্নস্তরের মানুষকে নানাধরনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওখানে (পার্টি-ও) সংঘ - বদ্ধ হতে প্রলুব্ধ করেছে। তারা গণনাট্যের আদর্শ উদ্দেশ্য ইত্যাদি সবকিছুকেই নিজেদের মাপমতো করে ফেলতে পেরেছে। সেই অবকাশ সংঘ চর্চায় আছে বলেই তারা তা পেরেছে। আবার অনেক প্রাজ্ঞ নাট্যকর্মী সরাসরি এসবের বিরোধিতা করেন না, কেন মিছিমিছি ঝামেলায় যাওয়া! কিন্তু এই মনন এই বোধ এক ধরনের প্র্যাক্টিস সামন্ততান্ত্রিক চর্চার জন্ম দেয়। সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া নাট্যদলগুলির চর্চা পদ্ধতিতে একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রকরণের প্রশ্নহীন প্রবেশ যথেষ্ট আশঙ্কার। সেই নাট্যদলের সঞ্চালকেরাই যখন গণনাট্যের উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে ভাষণ দেন, প্রবন্ধ লেখেন তখন সেটা ওই বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে নিজেকে সৎ গান্ধীবাদী প্রমাণের মতো। আসলে প্র্যাক্টিস প্যাটার্নটাই কখন যে ভেতরের দর্শনকে একেবারে বিপরীত মেরুতে নিয়ে যায়, দর্শনের দুর্বলতা কখন যে কৃত্য আর বক্তব্যের ভেতর শত যোজনার ব্যবধান গড়ে দেয়– সে বোঝা বড় কঠিন।

বিষয়টিকে এবার অন্য আরেক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। নাটককার বা পরিচালক যে বিষয়টি দর্শকের কাছে পৌঁছতে চান, যে concept (সেমিওটিকস্ অনুযায়ী যা কিনা signified)—তাকে পৌঁছনোর জন্য যেসব পদ্ধতি একেবারে শব্দ -উপমা-চিত্রকল্প সমেত (যা হচ্ছে কিনা sign vehicle, signifier)—একটা সংঘাত বাধে সেখানেও। সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে যে বিষয় নির্বাচিত হলো তার একটা গভীরতা, বাস্তবতা অবশ্যই থাকবে। অথচ প্রকাশের সমস্ত উপাদান কিন্তু সংগ্রহ হতে থাকবে অবশ্য করেই নাটককার পরিচালকের নিজস্ব বৃত্তি থেকে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তখন যে স্তরে স্রষ্টার অবস্থান, তাঁর শিল্পে ব্যবহৃত সব উপাদান তো সেই স্তর, সেই হয়ে ওঠা– কে আত্মস্থ করেই। সেই বৃত্ত, সেই গোষ্ঠী-মননে গরিষ্ঠ অশিক্ষিতজনেরা (!) কোনো প্রবেশপথ খুঁজে পাচ্ছে কিনা সেইটাই বিচার্য। উল্টোদিকে, সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের প্রচলিত সমস্ত পথপদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষদের নানাভাবে একেকটা ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বেঁধে ফেলার প্রচ্ছন্ন অথচ প্রবল কিছু পথপদ্ধতি চালু রাখে। তাদেরই নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমগুলির প্রশংসায় কেউ কেউ বিশিষ্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান, প্রশ্নাতীতভাবে সবাইকে যেন সেইটাই মানতে হবে, অন্য কোনো পথ আর নেই। আবার কাউকে তেমনভাবে কব্জা করতে না পারলে স্রেফ উপেক্ষায় কিংবা আরও সব প্রচলিত পদ্ধতিতে একেবারে অস্তিত্বহীন করে দেবার সকল পদ্ধতিও রাষ্ট্রের জানা। আর তেমন বহু উদাহরণও আমাদের অজ্ঞাত নয়। সাম্প্রতিককালে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিচর্চার খবর এখন আমাদের চোখের সামনে। সেইসব দেশে বা বিভিন্ন দেশে নানা কারণে ঘুরতে গিয়েও সেইখানকার পদ্ধতি প্রকরণ দেখে আসা গেছে। আমরা, নাট্যচর্চাকারীরা, সেইসব ভঙ্গিগুলোকে আমাদের এইখানকার পরিবেশনায় জুড়ে দিই। আমরা একবারও ভাবিনা সংস্কৃতির যে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ওইসব ভঙ্গিমাগুলো বিভিন্ন দেশে উঠে এসেছে, আমাদের দেশ কাল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কতজনের কাছে তা গ্রহণীয়! ফলে একধরনের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতেই সার্থকতার চিহ্ন সব ফুটে উঠতে থাকে—মাইনরিটি কালচার এর তত্ত্ব বাস্তবতা পায়। কারণ বেশি ভাগ মানুষের কাছে তা বড়জোর ভোজবাজির মত চোখ ধাঁধাতে পারে কিন্তু মনের ভেতর তার প্রভাব - প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এবং সেটা হতে পারে, সমাজতাত্ত্বিকভাবেই একেবারে অসম্ভব। অথচ প্রচার প্রশংসা পুরস্কারে সেটাইকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রবণতাই শিল্পের প্রকৃত আরাধনা।

আমার কথা হেথা কেহ তো বলে না

এখন আমাদের মানসিকতা আমাদের রুচিবোধ তৃপ্তির উপকরণ যেভাবে তৈরি হয়েছে, যেভাবে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাতে তো আমার কোনো হাত ছিল না। আমি চেষ্টা করলেও একজন চা শ্রমিক বা একজন খনি মজুরের মানসিক গঠনটা নিজে ভেতরে বসাতে পারবে না। আর এই না বসানোর জন্য যে বিভিন্নতা, যে বৈচিত্র সমাজে থাকে, তাতেই সমাজের সৌন্দর্য— অনেক প্রাজ্ঞজনই এমন কথা বলে থাকেন, প্রতিধ্বনি করেন। তাঁরা আরও বলেন, নিজেদের জোর করে জনসংলগ্ন দেখানোর একটা প্রবণতা, সেটাকে ভড়ংও বলা যায়—তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যা জানিই না, কোনোদিন যাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই, সেই জীবন, সেইসব মানুষের কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে কেন? কোনো দায় নেই আমার, স্রষ্টার কোনো দায় থাকে না!— প্রগতিবাদী সমাজসচেতন বহু নাট্যকর্মীও এখন এসব কথা প্রকাশ্যে বলে যে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন কারণ এই সমাজ যাঁদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যাঁরা প্রায় প্রশ্নাতীতভাবে নাট্যসমাজ শিরোমণি তাঁরাও একই ভাষায় সর্বত্র উগরে দিচ্ছেন। ফলে প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারিরা আনন্দে বিহ্বল, মানসিকতার আধুনিকতম অবস্থানে আমিও আছি!—প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থানের গণ্ডীকে বার বার অস্বীকার করে বাইরে এসে বিশ্বলোকের সাড়া পাবার অনাগ্রহ আমাদের ক্রমশ ওইসব গণ্ডীবদ্ধ তত্ত্বের কাছে নিয়ে যায়। হয়ত কাজটি ততটা সহজ নয় কিন্তু প্রচেষ্টা জারি রাখলে একসময় ঐ মাইনরিটি কালচার তত্ত্বের অসারতা নিজেদের কাছেই ধরা পড়বে। শেক্সপিয়র -এর থিয়েটার সম্পর্কিত উল্লেখিত উদ্ধৃতিটির একটি লাইন আবার বলা যাক এখানে— 'Its vitality was due its broad contact with popular entertainment and popular thinking...। শেক্সপিয়র-এর সময়কার ইংল্যান্ডে এটা প্রচলিত ছিল, আপনি এক পেনিতে কী কী করতে পারেন। তাঁর সময়কার দর্শকের পরিধিতে কারা কারা থাকতেন সে সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায়। এমনকী, খুব সাম্প্রতিক সময়ে Shakespeare in love ছবিটিতেও শেক্সপিয়রের দর্শকদের সম্যক প্রমাণ আছে। শুধু কনসেপ্ট বা signified হ নয়, সাধারণ বহু মানুষকে নাট্যে দর্শক করে তোলার জন্য শেক্সপিয়র তাঁর নাটক সাজিয়েছেন হত্যা ভুত ডাইনি ট্র্যাপডোর ইত্যাদির মায়াজালে আর এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। মাইনরিটি কালচার -এর তত্ত্ব তো এই শেক্সপিয়রের কর্মে ও কথায় ফুটে উঠলো না! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে যায়, ওই রকম নাটককার ব্যতিক্রমী, একজনই হয়। সবার পক্ষে তেমন হওয়া— ! হয়ত সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর জোরের জায়গাটাকে নস্যাৎ করে দিয়েই অসামান্য সৃষ্টির তত্ত্ব হিসেবে যে এক উদ্ভট বিপজ্জনক হাজির করছি, সেটাও হিসেবে থাকে না। ঐ মাইনরিটি আর্টের তত্ত্ব আমাদেরকে আত্মতৃপ্ত করে, সাধারণের পক্ষে আমাদের এইসব কাজ চট্ করে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরাও যে সাধারণকে বোঝার জায়গা থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে নার্সিসাস হয়ে ফুটে থাকছি— সে হিসেবে থাকছে তো! নাট্য তো প্রতি অভিনয়ে বহু-র আকাঙ্ক্ষা করে। চিত্রকলা কিংবা কাব্য হয়ত করে না, কিন্তু একেবারেই কি করে না! নাহলে কেন ভিক্টর ব্যানার্জীর বৈঠকখানা থেকে চিত্রপ্রদর্শনীকে বর্ধমানে পাঠানোর প্রস্তাবনা! তবুও কোনো পেইন্টিং বা কোনো কবিতা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যায়, নাটকের টেক্সটও সংরক্ষিত থাকবে কিন্তু প্রতিটি অভিনয়— সে তো আজকের গরিষ্ঠজনদের জন্য আকুল হতে বাধ্য।

আমাদের বিস্মৃত চর্চাপথ

যে গণ্ডীবদ্ধতাকে অনিবার্য অর্থাৎ সবার জন্য নাটক নয়— এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য এত যে প্রচেষ্টা, অন্তত এই বাংলাদেশেই একেবারে এর উল্টো কথাটা শোনা গিয়েছিল বহুদিন আগেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দর্শন এবং চর্চায়। যদিও এর আগেও কোলকাতার বোর্ড থিয়েটারের বহু 'বই' -এর অভিনয় হয়েছে দূরবর্তী মফস্বলের নাট্যমোদিদের দ্বারা তবু সেসব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল প্রায় হুবহু প্রতিচ্ছবি। নাট্যচর্চার নির্ভেজাল আনন্দ অবশ্যই এতে ছিল কিন্তু একেবারে গোড়া ধরে বোধ এবং প্রকাশের উন্নয়ন যে ছিল না, বলা বাহুল্য। গণনাট্য সংঘ একই সঙ্গে কিন্তু কনসেপ্ট (signified) এবং সাইন ভেহিকল্ (signifier)-এর সহজ সম্মেলন ঘটালেন। তাঁদের ঘোষণাপত্রেও নানাভাবে এটাকেই প্রাধান্য দেবার কথাও উচ্চারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে যাওয়া স্বাভাবিক, যে কারণে নীলদর্পণ-এর উপর ব্রিটিশ শাসকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেয়েছিল তাতে, গণনাট্য সংঘের কাছে সেই জনজাগরণের সমস্ত আয়োজন দেখেও ব্রিটিশ তাকে এতটা স্পেস্ ছেড়ে দিয়েছিল কেন! এটি একটি অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন, এ বিষয়ে বিশদ বলা আলোচনাকে ভিন্ন পথে নিয়ে চলে যাবে বলে ধারণা। তবে প্রশ্ন যখন উঠেই গেল, তখন সংক্ষেপে এটুকু বলা প্রয়োজন, বিংশ শতাব্দীর দুই তিন দশকের মধ্যে শোষণের পদ্ধতিতেই কিছু কিছু পরিবর্তন সাম্রাজ্যবাদীরা উপলব্ধি করেছিল। একবারে হাঁসটিকে না মেরে ধীরে ধীরে সমস্ত স্বর্ণসম্পদ আত্মসাতের পদ্ধতি তাদের শাসনের বহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। এমনকী, খোদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টেই নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে প্রশ্ন, ভারতীয় সাধারণ মানুষদের জেগে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রিটিশ হিংসাকে কিছুটা ব্যাক্‌ফুটে যেতে বাধ্য করেছিল। একই সঙ্গে নীলদর্পণকেও নিষিদ্ধ করা যাতে এ আগুন বেশিদূর না ছড়ায়,

আর অন্যদিকে নীলকর সাহেবদের আচারআচরণকে সংযত করার উপায় গ্রহণ—এই দুইই বাস্তব হয়ে উঠেছিল। নাট্যচর্চাকেও, খোদ ব্রিটেনেই, জোয়ান লিটলউড্ - দের থিয়েটার ওয়ার্কশপ ভারতের পরাধীন হয়ে যাবার ঘটনাকে নিজেদের প্রযোজনায় জায়গা দিয়েছিলেন। নীলদর্পণ যেখানে একেবারে ভূমিজ মানুষদের বিদ্রোহের কথাকে সামনে নিয়ে আসে, ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি আর তার আশ্রিত স্বদেশীয় দালালদের চেহারাটাকে একেবারে টান দিয়ে খুলে দেয়, তোরাপ সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোগ সাহেবের উপর, সেইখানে নবান্ন-র বিষয় কিন্তু অনেক বেশি সংস্কারমূলক! নাট্যশেষে, প্রধান -এর গ্রামে ফিরে যাবার উদাত্ত আহ্বানের ভেতর দিয়ে যে প্র্যাক্সিস -এর কথা উঠে আসে, তাতে রাষ্ট্রশক্তি অনেকটা আড়ালেই থাকে। কন্ট্রোল - মালিকদের আর একটু দূরবর্তী অঞ্চলে আলো ফেললেই উঠে আসত ব্রিটিশ রাজশক্তির সেই নির্বিকার প্রশ্রয়দানকারীর ছবি। কিন্তু সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ এবং অবস্থান সংঘের উপর অপ্রত্যক্ষ একটা প্রভাব ফেলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, দেশভাগের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ প্রকাশ ও বিশ্লেষণ এবং অবস্থান সংঘের উপর অপ্রত্যক্ষ একটা প্রভাব ফেলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, দেশ ভাগের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ প্রকাশ ও বিশ্লেষণেও কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টি প্রভাবিত কথা সাহিত্যিকরা কিছুটা দূরবর্তী হয়ে ছিলেন— উর্বশী বুটলিয়া-র ভাষায় দাঙ্গার যে ইতিহাস ভুলে যাওয়া অন্যায় এবং মনে রাখা গভীর আশঙ্কার। যাইহোক নাট্যের ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘ, তার কনসেপ্ট এবং কন্‌সেপ্টকে বয়ে নিয়ে যাবার বাহনগুলি (ভেহিকল্)-কে এক জায়গায় মেশাতে পেরেছিলেন। এরপর শুধু এই রাজ্যে নয়, গণনাট্য সংঘের পথ ধরে পিপল্-কে স্টার করার যে চর্চা, সেটা ছড়িয়ে পড়লো আরও বহু রাজ্যে। অবশ্যই মহারাষ্ট্র বা পাঞ্জাব এই ধরনের কম বেশি চর্চা চল্লিশের দশক থেকেই চলছিল, এখন প্রায় তা সার্বজনিন হয়ে গেল। দেশভাগের পর পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার গণনাট্যের উপর দায়িত্বের চাপটা যেন বেড়েও ছিল। এবং ততদিনে সাধারণ মানুষের থিয়েটারের একটা চর্চা একটা প্যাটার্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উছছিল। অর্থাৎ আমাদের বিষয় এবং বলার পদ্ধতিটাও খুঁজে নিতে হবে আমাদের দর্শকদের কথা মনে রেখেই। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানমঞ্চে না, লোক সংস্কৃতিকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার, তাকেই সৃষ্টির উৎস হিসাবে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াও জোরদার হয়ে উঠছিল। এটা ঠিকই পঞ্চাশের দশকের প্রায় গোড়া থেকে গণনাট্য সংঘের ভেতরে ক্ষমতাজনিত সংকীর্ণতার চর্চা, মধ্যমেধার লোকেদের কেবল অনুগত্যের মুচলেকায় নেতৃত্ব পর্যন্ত উঠে যাবার একটা প্রবণতা এবং ঘোষিত পদ্ধতিকে অ-মর্যাদায় প্রায় ব্রাত্য করে রাখার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে জনসমুদ্রে জোয়ার নেমে এসেছে, নাট্যকর্মীরা নিজেদের বোধবুদ্ধি অনুযায়ী নাটক লেখা ও প্রযোজনা করার সাহস পেয়ে গেছেন, নতুন নতুন অঞ্চল তখন ওই নতুন চিন্তাধারায় প্লাবিত হতে শুরু করেছে। সর্বত্র ততটা সক্ষমতায় না হলেও মিলছে কন্‌সেপ্ট আর কন্‌সেপ্ট ভেহিকল, নির্মাণ পদ্ধতিতে কম বেশি সবার যোগদান এবং তার স্বীকৃতি— দীর্ঘদিন এই বিষয়টি প্রায় স্বাভাবিক হিসাবেই গণ্য হতে লাগল।

তোমার অসীমে প্রাণময়ে লয়ে

এই পর্যন্ত এসে আমাদের একটু থামকানো দরকার। প্রয়োজন আবার একটু পেছন ফিরে তাকানোর। বলা নিষ্প্রয়োজন, বাংলা তথা ভারতবর্ষে এমনকী, গোটা বিশ্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটক একটি সম্পদ বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক লিখছিলেন, তখন বাংলাদেশের প্রচলিত নাট্যর্চ্চা এমনকী ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পরিমণ্ডলের ভেতরেও যে নাট্যসংস্কৃতির প্রবল জোয়ার, সেখানে থেকেও রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র ধারা । এবং সেটি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা বাল্মিকী প্রতিভা-তেই সুস্পষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সেই সময়কার মাইকেল - গিরিশ - এর বিস্ময়কর প্রভাবকে সম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র সক্ষম নাট্যস্থাপত্য গড়ে তোলা বড় কম কথা ছিল না। একধারে বিস্ময়কর প্রতিভাসম্মন্ন নাটককার, অসামান্য দক্ষ নট এবং সমসময় থেকে বহু এগিয়ে থাকা পরিচালক— এত সক্ষমতার একপাশে মিশেল পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে হাতে গোনা। বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে তিনি যেন একটি ভিন্ন কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা করে নতুন মন্ত্রে অর্চনার সূচনা করে দিলেন। নাট্যের বিষয়কে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ করে তোলা, অসামান্য সংলাপের রহস্যময়তা ও কাব্যগুণ যেন একেবারে নিক্তি ধরে মাপা, মনোজগতের এমন সহজ অথচ সুগভীর বিস্তার এবং তার সঙ্গে সামান্য পরিসরে চিরন্তন সমস্যার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত— বাংলাদেশের নাটক রচনায় এমন চতুবর্গ লাভ এর আগে আর পরিলক্ষিত হয়নি। —রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে হয়তো নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। কথাটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে এ সবই দেশবিদেশের বহু সক্ষম মানুষ নানাভাবে আলো ফেলে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ নিয়ে যে কোনো কিছুই বলা বাহুল্যমাত্র। তবে এর পাশাপাশির আর একটি বিষয় সম্পর্কেও হয়তো নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। কথাটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটককার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। যদিও এ নিয়ে সাধারণ একটি মন্তব্য আছে যে সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একমাত্র ‘রাজা ও

রানী' ছাড়া আর সবগুলি নাটকই রবীন্দ্র - কাহিনী নিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকবাবুদের নাট্যরূপ। যাই হোক, পরবর্তী ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাটকে জনসমাগম না হওয়ায় রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ বহু প্রাবন্ধিক - সমালোচক এ বিষয়ে হতভাগ্য বাংলাদেশকেই দায়ী করেছেন— কবিকে গ্রহণ করতে পারিনি আমরা। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আধুনিকতম কারিগর নাট্যচার্য শিশিরকুমারকে 'তপতী' নাটকে অভিনয়কালে তাঁর সুহৃদরা পরামর্শ দিয়েছিলেন— যে সব দর্শকের পয়সায় রঙ্গমঞ্চ চলছে, তারা তপতী বুঝবে না। নাট্যচার্য শিশিরকুমার 'গতানুগতিক রীতিতে গ্যালারি' না মাতানোর দৃঢ় বাসনায়, তপতী মঞ্চস্থ করেন কিন্তু দর্শকের অভাব আর্থিক সাফল্য এনে দিলো না, 'আর্টিস্টিক সাফল্য' -র অনুভব হয়ত পরিচালককে তৃপ্ত করেছিল। যে শিশিরকুমার বলেছিলেন, পার্ট করারও দরকার নেই কেবল তিনি নাটক পড়ে গেলেও শোনবার লোকের অভাব হবে না, সেই শিশিরকুমারও খালি চেয়ারকেই দর্শকাসীন ভেবে অভিনয় করার পরামর্শ দিতে বাধ্য হন। তপতীর আগে বৈকুণ্ঠের খাতা, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা পাবলিক স্টেজে অভিনীত হয়েছে কিন্তু যে অর্থে, একটি প্রযোজনা চলে সেভাবে চলেনি। সাধারণ রঙ্গালয়ে 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম বিজ্ঞাপন এইরকম— জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের/ বিশ্ববিশ্রুত নাটক/ বিসর্জন/ রঘুপতি— শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ী/ এই/ বিসর্জন/ অধুনা প্রচলিত বিসর্জন নাটককে ভাঙিয়া গড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে।—" তাহলে 'অধুনা প্রচলিত বিসর্জন' নাটকের গঠন এমন কী ছিল, যাকে দর্শক সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার মানসে ভাঙতে গড়তে হয়! এমনকী রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন 'সহজে অভিনয় করিবার জন্য' অচলায়তন, শাপমোচন, গোড়ায়গলদ এসব নাটককে নতুন করে লেখেন তখন পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ধরে ধরে বোঝা যেতে পারে, দেখানোও যায় যে কলিকাতা বা শান্তিনিকেতন -এর সমাগত বিদ্বজ্জন সমাজ আর বাংলাদেশের সাধারণ দর্শকদের গ্রহণ ক্ষমতার ফারাক কীরকম এবং কতটা!' '—রবীন্দ্র অভিনয়ের দর্শক শ্রোতা সাধারণ সমাজের ওপর তলার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেই আসতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের গতানুগতিক নাটক দেখার মানসিকতাসম্পন্ন অল্পশিক্ষিত দর্শকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকে রসগ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রাবন্ধিক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী-র এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য এবং এই সত্য আমাদের আরো গভীরতর অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়। দেশের গতানুগতিক নাটক দেখায় অভ্যস্ত অল্পশিক্ষিত মানুষেরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারেন নি সে নিয়ে অভিমান ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও এবং তাঁর তখনকার ও পরবর্তী গুণগ্রাহীদের তো বটেই। কিন্তু এই সত্যিটা আমরা বিস্মৃত হই, যে মনন যে শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ লালিত, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে তা সুদূরবর্তী। এমনকী কলকাতায় যারা গতানুগতিক নাটক দেখায় অভ্যস্ত, তাঁরাও অর্থের দিক থেকে হয়ত স্বচ্ছল কিন্তু মনের দিক থেকে এখনও প্রাচীন অবস্থাতেই পড়ে আছেন। এ ছাড়া রয়েছে এক বিস্তারিত বিপুল জনজগত। তাঁদের আচারব্যবহার রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা এসব কোলকাতার হিসেবে মেলে না— যেন এক স্বতন্ত্র ভিন্ন সচল ধারা— ফল্গুর মতই তা প্রবহমান। তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা সহজ কিন্তু তার কাছে যাওয়া যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। অবশ্য এর জন্য এক বিশেষ মননের চর্চাও প্রয়োজন। অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের বহু সাধারণ মানুষের গৌণ ধর্মচর্চার মতো। যাইহোক, আমাদের মূল আলোচনায় তাহলে সেই জিজ্ঞাসা নিয়েই ফেরা যাক, রবীন্দ্রনাট্যের আবেদন প্রকৃতপক্ষে কোন অংশের কাছে! নাকি, শেক্সপিয়র -এর নাটকের মতো নানা পদ্ধতিতে সেই আবেদন-পরিধি ছাড়িয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল প্রাকৃতজনদের মধ্যেও!

একভাবে বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাটকের যে বিশ্বমানবিক বক্তব্য, কনসেপ্ট, তাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে সব মাধ্যম (ওই signifier) সেইখানেই একটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা। যে ভাষায় চরিত্রেরা কথা বলেন, ভাষা তো একাট 'sign'ই বটে, সেই ভাষার ইশারা বুঝতে অক্ষম অন্য অবস্থানের মানুষেরা। আবারও বলা প্রয়োজন, ঘটনার অন্তর্বস্তু মহত্তর হলেও বিন্যাসের ভাষায় তা বেশির ভাগ দর্শকের কাছে দূরূহ দূরবর্তী রয়ে গেল। একসময় সাধারণ রঙ্গালয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয় নাটককার ছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর উপন্যাসগুলির স্বকৃত অথবা অন্য কারো নাট্যরূপ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলো। একসময় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসভিত্তিক নাটকও সাধারণ রঙ্গালয়কে সচল রেখেছিল। যাইহোক, ষোড়শী নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ছিল এই যে 'উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে' ভুলতে হবে, সাহিত্যে চিরন্তন ভাবনাকেই বেশি মূল্য দিতে হয়। এখন সমকালের জনাগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিনম্র বিতর্কও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। একথা ঠিকই, শরৎচন্দ্রের সেইসব উপন্যাস আশ্রিত নাটক আজ একশ বছর পরে যথেষ্ট সেকেলে বলে মনে হয় আর রবীন্দ্রনাটক প্রায় শতাব্দী প্রাচীন হয়েও আমাদের কাছে সহজপাচ্য হয়নি। আমরা যারা সাধারণ, তাদের কাছে। রবীন্দ্রনাথও কি সৃষ্টির এই দুরূহতা একটা সময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে/প্রবেশ করিব সেথা সাহস ছিল না একেবারে।—প্রকৃতই কি সাহসের অভাব! নাকি, যাপন অভ্যাসেই স্বতন্ত্র রয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ! যেভাবে বললে তাঁর ওইসব মহত্তম সব বিষয়ের কিছুটা বা আমাদেরকেও আকৃষ্ট করতে পারত, সেই আকর্ষণ ক্রমে আমাদেরকে আরও বেশি তার কাছে নিয়ে যেতে পারত—ওই sign vehicle গুলির রহস্য ভেদ করতে পারলাম না বলেই দূরবর্তী রয়ে যাওয়া। আর এজন্য আমরা নিজেরাও তো খুব একটা দায়ী নই। প্রকৃতপক্ষে যদি একই সঙ্গে অসামান্য সহজবোধ্য sign-vehicle! এমনটা কি উপলব্ধি করেন নি স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ! একটা সময় যখন নাটক থেকে ক্রমশ নৃত্যছন্দে সংগীতকে রূপ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিলেন', যখন ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ছে যে, '(তাসের দেশ) নাটকের মধ্যে কথোপকথন বেশি থাকায় কবি বুঝিলেন যে দর্শকশ্রোতার পক্ষে তাহা তেমন বোধগম্য হয় নাই। সেজন্য পরদিন অনেক নতুন গান ও নৃত্য সংযোগ করিয়া অভিনয়কে প্রাণবন্ত করিয়া করিয়া তুলিলেন—' তখন একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বপাড়ার প্রাঙ্গণের বেড়াগুলোর ভেতরে প্রবেশ করার পথ খুঁজছেন। 'শ্রাব্য ভাষা অপেক্ষা দৃশ্য ভাষার আবেদন অধিকতর ব্যাপক বলিয়াই এই নূতন পদ্ধতি অবাঙালী সমাজেও আদরণীয় হইবে—' পাটনায় চিত্রাঙ্গদার অভিনয় সম্পর্কে এমনই মতামত প্রতিবেদকের (২৪ মার্চ, ১৯৩৬, আনন্দবাজার পত্রিকা)। এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথেরও তাই-ই। শুধু অবাঙালী সমাজে কেন, বাঙলা ভাষায় কথা বললেও নানা কার্যকারণে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গভীরতম অর্থবহ নাট্যসংলাপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অশক্ত, তাদের জন্যও এমত দৃশ্য-পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। দর্শনেন্দ্রিয়কে ব্যস্ত রেখে শ্রবণের ভেতর দিয়ে সেইসব সংলাপ যাব প্রথমবারে প্রবেশ করত, সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পূর্ণ অর্থ অনুধাবন করতে না পারলেও আকৃষ্ট থাকা যেত— কারণ তখন দৃশ্যপটে নতুন নতুন ছবির বিন্যাস ফুটে উঠছে।

এই ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদকের দেখা মত দু'একটি রবীন্দ্র প্রযোজনার সাম্প্রতিক বিন্যাসকে উদাহরণ হিসাবে এখানে বলা যেতে পারে। যেমন, কোলকাতা ব্লাইন্ড অপেরা বা অন্যদেশ (পরিচালনা : শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়)-এর রক্তকরবী, রাজা, চণ্ডালিকা, কাঁচরাপাড়া পথসেনা-র রক্তকরবী, কলাক্ষেত্র, মণিপুর (পরিচালনা : কানহাইয়ালাল)-এর ডাকঘর। এই প্রয়োজনাগুলির সবকটিতেই এক আশ্চর্য মিল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্মাতারা সংলাপের সঙ্গে গেঁথে দেন এক বিরামহীন চলমানতাকে। অঙ্গনমঞ্চের প্রথা মেনেই শরীরী বিভঙ্গে সবসময়ই ফুটে উঠতে থাকে নতুন নতুন ছবি, পথসেনা-র প্রয়োজনা যেন একটি ছন্দোবদ্ধ নৃত্য- পরিকল্পনা। শুভাশিসও তা-ই করেন, তাঁর প্রযোজনায় সবসময় ঘটনাগুলি যেন পথপার্শ্বে ঘটে চলে অথবা কোনো পাবলিক প্লেস-এ, পেছনে জনতার প্রবাহ। কখনও সঙ্গতিহীন মনে হলেও নাট্য থেকে মুখ ফেরানো যায় না। কানহাইয়ালাল তো ডাকঘরের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের সংলাপকে শ্রীহট্টের মণিপুরের নিজস্ব ভাষায়, উচ্চারণে পাল্টে দেন, আমল (অসামান্য অভিনয় করেন প্রবীণা অভিনেত্রী হেইসাম সাবিত্রী) যেন কেবল রুগ্ন স্থির একটি বালক নয়, প্রকৃতির মধ্যে লালিত, একদা অফুরান প্রাণশক্তির আধার হয়ে ওঠা অমল। এবং কেবল সংলাপের ইশারায় নয়, নৃত্যে, নির্বাক অভিনয়ে এসব আমরা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করি। প্রযোজনার উৎকর্ষতা নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু ওইসব প্রযোজনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কনসেপ্টকে একই রেখে চেষ্টা ছিল sign vehicle বা signifier-দের নবতর নির্বাচন, তাদের নবতর উপস্থাপন। উদ্দেশ্য সেই একই, আরও বেশি মানুষকে ওই কনসেপ্টটা পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা। কেবল মাইনরিটি কালচার বলে ক্ষুদ্রবৃত্তে বলীয়ান হয়ে ওঠার পাঁচ পয়জার নয়, যাঁরা প্রকৃত অর্থে অগণন দর্শক, তাঁদেরকেও টেনে নিয়ে আসা।

এখন এই sign vehicle ব্যবহারের আরেকটা বিপদও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে জুড়তে গিয়ে এমন কিছু বিচ্ছিন্নতার রহস্য তৈরি করেন, সে-ওশরীরি ভঙ্গিমায় বা অন্যান্য উপাদানের মধ্য দিয়ে, যার প্রাসঙ্গিকতাই অধিকতর রহস্যময় হয়ে ওঠে। আধুনিক কাব্যের যে বর্ণনাগত উল্লম্ফন, যা ধরতে পারলে কবির সঙ্গে সঙ্গে চলা সহজ কিংবা চিত্রকল্প উপমা ব্যবহারের ভেতর দিয়ে যে আপাত অধরা কাব্যস্মৃতিটি পাঠকের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে পাঠকের অবস্থান না বুঝেই তার ব্যবহার আবার সেই আমড়াতলার মোড়েই এনে ফেলে দেয়। কবি এবং পাঠক— কে দাঁড়াবে সীমাবদ্ধতা কিংবা অক্ষমতরা কাঠগড়ায়! রবীন্দ্র প্রযোজনাতেও তেমন একটি বিচ্ছিন্নকরণের প্রচেষ্টা ওই মাইনরিটি কালচার-এর প্রবক্তাদের কাছে সঙ্গত বলে মনে হয়। এবং সানন্দে সগর্বে তাঁরা যা গ্রহণ করেন তা হচ্ছে অত্যন্ত সীমিত শিক্ষিত (!) কিছু দর্শকের সমালোচকের সানন্দ অভিবাদন! এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই অসামান্যতার প্রচার!

অন্য একটি বিষয়ে—অবশ্যই প্রাসঙ্গিক—কিছু কথা বলা যেতে পারে। বাউলরা যে দেহতত্ত্বের গান করেন তার গভীরতা একবার শুনে ধরে ফেলতে পারে আদৌ সহজ কাজ নয়। এক অর্থে, এক ধরনের চর্চার ভেতর দিয়ে না গেলে সেইসব সঙ্গীতের গভীরতর অর্থ অনুধাবন প্রায় অসম্ভব। আবার ওই চর্চায় অভ্যস্ত যাঁরা, তাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত হিসাবে পরিচিত না হয়েও সেইসব সঙ্গীতের ভেতরকার রহস্য উন্মোচন ও ব্যাখ্যায় পারঙ্গম। হাটে ডিম বিক্রি করেন যে দরিদ্র গ্রামীণ মানুষটি, ওই সব গানের তত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতই বিত্তবান— এবং বহু মানুষের সন্ধান দিয়েছেন বাউল - ফকিরদের সঙ্গে দীর্ঘদিন সহমর্মী হয়ে থাকা গবেষক - প্রাবন্ধিকেরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বহু-র কাছে তো সইসব গান সত্যিই অধরা, তবু গ্রামের মানুষজনেরা কেন সারারাত জেগে সেইসব আসরই জমিয়ে রাখেন। মাইনরিটির তত্ত্ব তো সেখানে আলোকোজ্জ্বল হ্যাজাকের উপর কুয়াশার মতো উবে যেতে থাকে! এখানেও কিন্তু ওই একই বিষয় বিবেচনা করতে হয়। একজন বাউল-এর জীবনচর্চা, তাঁর কথা তাঁর পদ এমনকী তাঁর পোশাকও সাধারণ মানুষের মতো কিন্তু একেবারে সাধারণ নয়। তাঁকে যেন স্পর্শের মধ্যেই সহজে আনা যায় কিন্তু অতটা সহজ নয় গানের ক্ষেত্রেও তাই! ওইসব গানে যে সব শব্দ চিত্রকল্প - উপমা ব্যবহার করা হয়, তার প্রায়

সবটাই সাধারণের পরিচিত। একেবারে সহজ সাধারণ চেনা কথা! আর সেই সব চেনা শব্দকণা চিত্রকল্পের পথ ধরেই চলে গভীরতর এক অনুসন্ধানের প্রস্তুতিপর্ব। বাউল ফকিরদের গায়নভঙ্গিটিও কোনো বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেন না! তাঁদের জীবনচর্চা তাঁদের সৃষ্টি ও পরিবেশন যেন দেখা না-দেখায় মেশানো। সেইসব সঙ্গীতের সুরের বুনোন সম্পর্কেও তাঁরা এক সহজাত দক্ষতায় গ্রামিণ মনকেই যেন প্রাধান্য দেন। ওই গ্রামিণ প্রকৃতি, তার সুর শব্দ ধ্বনি সবকিছু প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে পুষ্ট করে তোলে তার স্রষ্টাকে, সহজেই সম্পৃক্ত করে তোলে অনুজ্জ্বল আলোয় ঘিরে থাকা প্রচুর 'অশিক্ষিত' শ্রোতাকে। গানের ভেতরকার একেবারে নিগূঢ় তত্ত্বের অংশটুকুকে তাৎক্ষণিকভাবে দূরে সরিয়ে রেখে বাকি সবটুকুই তো কনসেপ্ট ভেহিকল— ব্যাপক মানুষ স্বচ্ছন্দ সেখানে। নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়াতেও মাঝে মাঝে 'থোড়সা ফোক্ ডাল দিয়া'র যে উদ্দেশ্য তাও কিন্তু কোনো আপাত সীমাবদ্ধতার গণ্ডীর ভেতরে নাগরিক মানুষদের অন্য আস্বাদ দেওয়া, সেই ফেলে আসা দূর অতীতের মুছে যাওয়া দিনগুলির সুর জাগিয়ে তোলা। কিন্তু প্রায়শই যেটা হয়, আমাদের প্রয়োগে সেই সহজাত, দীর্ঘ চর্চাগত অনায়াস সক্ষমতা না থাকায়, মানসিকভাবে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেওয়ায় গোটা বিষয়টিই ছানা কেটে যায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সেটা ঘটে অন্যভাবে। কন্‌সেপ্ট বা সিগ্‌নিফাইড-এর অবস্থান যা-ই থাকুক, এ দেশের ব্যাপক মানুষ, এখনও সেইসব নাটকের বেশিরভাগ সাইন ভেহিকল্‌গুলিতে সহজেই নিজেদের আসন খুঁজে নিতে পারে না। ফলে পেছনে পড়ে থাকতে হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেক এগিয়ে থাকা, এটাও বাস্তব এবং এখনও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষায় বোধে বাধ্য হয়েই অনেক দূরবর্তী, এটাও ঠিক। অত্যন্ত দুঃখজনক, অথচ বাস্তব, রবীন্দ্রনাথকে সেই ব্যবধান স্বীকারের প্রচেষ্টা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

শেক্সপিয়র-এর নাটকে ওই সাইন ভেহিকলগুলি এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে নির্মিত যাতে সাধারণ কসাই থেকে রানী এলিজাবেথ পর্যন্ত সবাই তাদের নিজের মতো কিছু জায়গা খুঁজে পেতেন। অর্থাৎ চারপাশের অবস্থান বিবেচনায় নাটককে একই সঙ্গে সহজ (তরল যে নয়, এটা নিশ্চয়ই মানবেন) এবং গভীর করে তোলা, বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে আবেদন রেখে রেখে যাওয়া এবং সেই ধরতাইগুলোকে অবলম্বন করে তারপর আরও সমৃদ্ধতর মনের দিকে যাত্রা— এইটাই সম্ভবত আকাঙ্ক্ষিত। সেমিওটিক্‌স্-এর দিক থেকে এভাবে বলা যায়।— It is clear, though, that we do not go to the theatre only to be informed of 'other' worlds, however poweful a factor this kind of knowledge may be. We may well return to see plays whose dramatic content we know well, or even, at timesl, to the same production of a given play. 'Why', asks abrahmam moles, 'should we go to the theatre to see Hamlet performed if we know the ;play already?' The fact the our interest in a particular play or performance is not exhausted once the actual 'intellegence give' has been acquired suggests that there are other informational leves on which theatrical massages work...'এই যে 'Other informational levels' এর ধরতাই এটা কিন্তু শুরু হয় একটা চেনা পরিচিত অবস্থান থেকে। একটা 'Known world or content' কে আশ্রয় করে। সেইজন্য প্রাজ্ঞাজনেরা যখন বলেন, দেশের মিথগুলোকে নতুন করে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে এগোনো যায় অনেক বেশি বেশি করে, তখন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অগণিত সাধারণ দর্শকের একটা উত্তরণে অপ্রত্যক্ষ পথের কথাই আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। সাধারণ মানুষ চেনা কাহিনীকে নতুন বিন্যাসে দেখে প্রথমে নাট্যবিষয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন এবং নতুন ব্যাখ্যার হাত ধরে চলতে চলতে যে উপলব্ধিতে পৌঁছন, সেটাও নতুন আর সেই অন্য ভাবে ব্যাখ্যার পদ্ধতিও তাঁকে ক্রমশ 'শিক্ষিত' করে তোলে। শেক্সপিয়রের বহু নাটকের গল্প তো তখনকার ব্রিটেনের মানুষদের কাছে অতি পরিচিত, তবু সেই চেনা গল্পের গায়েই সন্নিবেশিত হতে থাকে আরো সব নতুন ঘটনার অলঙ্কার, চেহারা পাল্টে যেতে থাকে তার, প্রতিদিনকার ছবিই নবনব রূপে তাঁকে, দর্শকদেরকে, আকৃষ্ট করে রাখে। আর ওই সন্নিবিষ্ট ঘটনার চরিত্রদের কাব্যময় সুগভীর সংলাপ অন্য এক নান্দনীক আস্বাদন এনে দেয় তথাকথিত শিক্ষিতদের কাছেও।

এখন নাটকের সব ঘটনাই যে পরিচিতির জগত থেকে আমদানী করতে হবে, তা না- ও হতে পারে কিন্তু সেইসব নবতর কাহিনীর পরিবেশনে বিন্যাসে গরিষ্ঠজনেরা যেন একটা প্রবেশপথ দেখতে পান, যেন তাঁদের সামান্য পুঁজি নিয়েও ওই মহত্তর নান্দনিক নির্মাণের অংশীদার হতে পারে। নাহলে কোনো নির্মাতার সাইন ভেহিকল্-এর চমৎকারিত্বের তাঁরা, সাধারণ দর্শকেরা, বিস্ময়াবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু কনসেপ্ট-এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেন না অন্তত নাট্যনির্মাতা যা পৌঁছাতে চাইছেন। ফলে তাঁরা মুখ ফেরান আর আমরা মাইনরিটি কালচারের তত্ত্বে নিবিষ্ট হই। প্রগাঢ় দম্ভে উচ্চারণ করি, আমার হাতে নাই ভুবনের ভার। হয়তো পরে অন্য কোথাও বিস্তারিত আলোচনা হবে কিন্তু এমনটা কি মনে করা যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এমন 'প্রত্যাখ্যান' রবীন্দ্রনাথকে শ'দুয়েক বোদ্ধাদশক সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহের ভেতরকার নাট্যচর্চাকেই প্রকৃষ্ট মনে করছিলেন।

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে

আমরা বরং একটি নাট্যপ্রযোজনাকে উদাহরণ হিসাবে ধরে এতক্ষণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের একটা প্রত্যক্ষ ছবি সামনে আনতে পারি। বলা বাহুল্য, এ দেশে এবং বিদেশেও এরকম উদাহরণ অনেক, সেসব উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা

অন্য একটি প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে। সাম্প্রতিককালে কলাক্ষেত্র, মণিপুর এবং দ্রৌপদী আমাদের কাছে একটি নিবিড় পাঠের নাট্য। হেইসাম সাহিত্রী বা অন্যান্যদের অসামান্য অভিনয় দক্ষতা এইখানে আলোচ্য বিষয় নয়, আমরা দেখতে চাইবো, নাটকের কোন কোন উপাদান (সিগনিফায়ার বা সাইন ভেহিকল্) -এর মাধ্যমে চেনা ঘটনাটি নান্দনিকভাবে নতুনতর এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠলো। মণিপুরে রাষ্ট্রশক্তির দুঃশাসনীয় অত্যাচার এবং মণিপুরের চিত্রাঙ্গদাসম মহিলাদের প্রবল বিস্ময়কর প্রতিরোধ— এসবই বেশি কয়েক বছর ধরে ভারতের এবং পৃথিবীর গণ আন্দোলনের ইতিহাসে এক বেদনাময়, অতুলনীয় গৌরবগাথা। নির্মাতা কানহাইয়ালাল এই নিপীড়নকেই, প্রতিরোধকেই তাঁর নাট্যের মূল প্রতিপাদ্য করে তুললেন। এবং এমন সব প্রকাশ - ভঙ্গিমায় ব্যবহার করলেন যা প্রায় সবই আমাদের জানা অথচ এমন সম্মেলন আমাদের চিন্তাচেতনায় একেবারে নতুন করে এলো। ঠিক যেন একজন কবি-র মতো— তাঁর রচনার সব শব্দই আমরা জানি কিন্তু সাজনোর প্রক্রিয়ায় আমরা একটি নূতন অনবদ্য কবিতা পেয়ে গেলাম। মণিপুরের নৃত্য, তার সুরের সহজতা ওইখানকার পাহাড়ঘেরা উপত্যাকার মানুষদের ছন্দোময় জীবনযাত্রার সামনে রাষ্ট্রশক্তির কঠিনতম প্রকাশ— এসব কিছুই, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নান্দনিকভাবেও তা অসামান্য হয়ে উঠছে। মেনকী, মণিপুরের জননী জয়াদের উপর রাষ্ট্রের রক্ষকবাহিনীর গণর্ধণের উপস্থাপনা একদিকে যেমন চরম ঘৃণায় আমাদের কঠিন করে তোলে, অন্যদিকে সেটাও উপস্থাপিত হয় নাট্যের নান্দনিক শর্ত মেনেই। আমরা একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ ব্যথিতও হই আবার নন্দিতও হই। আমাদের সম্মিলিত চলার শুরুটা ছিল চেনা, স্রষ্টা নেমে এসেছিলেন আমাদের মধ্যে সাধারণদের কাছে তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে থাকি তাঁর অনুচ্চ নির্দেশিত পথে, নতুনতর সব উপলব্ধির তোরণ পার হয়ে হয়েই। সেই আমাদের নতুন সঞ্চয়, আমাদের নতুন কিছু দেখতে শেখার সহজ পাঠ।

এখন কাজ আরও অনেকেই আমাদের উপহার দেন। সেই বিশিষ্ট নির্মাতারা আমাদের সীমার মধ্যেই অসীমের সুরটি বাজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বার করে নিয়ে আসেন আমাদের, আমরা সমৃদ্ধ হতে থাকি। আমাদের চিন্তা চেতনা - বোধের পরিধিটা বেড়ে যেতে থাকে। সেইসব নির্মাতারা, আমরা ততটা শিক্ষিত নই বলে, ততটা বুঝমান নই বলে আমাদেরকে জর্জর অথবা দুর্বোধ্যতায় ভীত করে দূরে সরিয়ে রাখেন না। নানা কারণে আমাদের পিছিয়ে পড়া, সম্ভবত, কিন্তু সত্যিই কি পিছিয়ে পড়া। মূর্খের বিদ্যা মূর্খের, জ্ঞানীর বিদ্যা জ্ঞানীর। মূর্খও জ্ঞানী, পণ্ডিতও জ্ঞানী— একটি প্রাচীন ম্যাক্সিম্‌কে ঔপন্যাসিক শাহাযাদ্ ফিরদৌস যেভাবে তাঁর ব্যাসউপন্যাসে গেঁথে দেন, সক্ষম নাট্যনির্মাতা নাট্যকর্মীদের কাছেও সেটা নতুন করে ভাবার বিষয় হয়ে ওঠে। আপন হতে বাইরে এসে যখন কোনো নির্মাতা প্রকৃতই পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়ান, যখন নিজের হৃদয়ে বিশ্বলোকের সাড়া শুনতে পান এবং সেটা শোনাতেও চান, কেবল মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত স্বজনদের নয়, ব্যাপক মানুষদের, তখনই তাঁর রেখা রঙ সংলাপ সংগীত সবই বদলে যেতে থাকে। সেই শোনানোয়, সেই পৌঁছনোয় ব্যর্থ হয়ে গেলে, ওরা শ্রবণে অক্ষম— এই উচ্চারণ সহজ! কিন্তু কেন পৌঁছনো গেল না, আমাকে যেতেই হবে তাঁদের কাছে— এই দৃঢ়তা যে পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় সে অবশ্যই একটি দুর্গম শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা কিন্তু তখন আর একাকীত্বের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় না। আবার অন্যদিকে, অনেক কান্নাহাসিমিশ্রিত অশ্রুসজল পালা, যা বহুকিছুর পরও, তার সমস্ত প্রকাশ মাধ্যমগুলি আমাদের ধরতাই-এর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমাদের নতুন কোনো বোধের উত্তরণ ঘটায়। সে আমাদের গণ্ডীতেই আমাদের আটকে রাখে। সে যেন, দ্যাখো, কী ঘটছে, বলে যায় দেখায়, সে আমরা সহজেই চোখ মেললেই দেখতে পাই না। তার না থাকে কোনো নতুন বিশ্লেষণ, না নতুন কোনো নান্দনিক উদ্ভাসন। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওইসব নাটকের দর্শক হিসাবে সবই যেন আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরা হয়েছে, আমাদের কোনোকিছুই ভাবতে হয় না, ভেবে চর্চার আনন্দে নিজেকে নতুন করে ফিরেও পাই না। এইসব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান একেবারে নিষ্ক্রিয়, কোনো সচেতন বা প্রত্যক্ষ যোগদানের পথই খোলা থাকে না। সাইন ভেহিকল্ যাই হোক, এক্ষেত্রে, কনসেপ্ট -এর অবস্থাটি সত্যিই দুর্বল। সেই অবিরত ইশারার ভঙ্গি আমাদের চেনা হলেও জনি, সে আমাকে একেবারে অ-ফলদায়ী এক প্রান্তরে নিয়ে ফেলে। এই সহজতাকেও ওই আগেকার দুর্বোধ্য প্রচেষ্টার মতো বাহিরদ্বার থেকেই ফেরত পাঠাতে হয়।

কেন রে তোর দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়

আমরা যারা এখনকার চর্চায় নিমগ্ন, আমাদের একদিকে যেন নাট্যকলার বিজ্ঞান, সেখানে অতি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বদলে যাওয়া সময়ে বিশ্বব্যাপী পটের পরিবর্তন ইত্যাদি সবকিছুই যেমন জানতে হবে, তেমনি যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে তার হৃদস্পন্দনটাও অনুভব করা আত্মস্থ করা অতি প্রয়োজন। শারীরিক অথবা যান্ত্রিক উপায় অবলম্বনে আমরা বহুদূর পরিভ্রমণে স্বচ্ছন্দ, অভ্যস্ত কিন্তু নিজেদের দরজার বাইরের শিশিরবিন্দুটির জ্বলজ্বলে অস্তিত্বে আমাদের যেন কোনো টান নেই। আগ্রহ নেই কারণ সেই আগ্রহ থেকে যে প্রচেষ্টার জন্ম হয়, সেটা ছাড়াই আমরা এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রচারিত প্রশংসিত হতে পারছি। নিজেকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেখার সব পথ

পদ্ধতি যখন খোলা, তখন মুষ্টিমেয়র দলভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই তো লাভজনক! আসলে নিজের ঘরটিকে ছোট করে রাখলে সেখানে নিজেই প্রকাণ্ড। এতে একটা আত্মশ্লাঘা তো তৈরি হয়ই। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সবসময়ই আশঙ্কা, কী করে এই ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই দীর্ঘকাল প্রধান হয়ে থাকা যায় কারণ এই বিকৃত ব্যবস্থা অন্য কাউকে পাওয়া মাত্রই আমাকে নস্যাৎ করে দেবে। মানুষের কাছে চিরস্থায়ী করে রেখে দেবার মতো কিছুই তো করে দিই নি আমি কারণ আমি তো তাদের ভাষা জানিই না, তাঁদের কাছে যাবার জন্য নিজেকে ভেঙে গড়ে নতুন কোনো মূর্তি নিজেরই নতুন কোনো কাজের কাঠামো তো তৈরিই করিনি আমি, আপাত লাভের প্রলোভনে সেদিকে যেতেও চাই না আর। ফলে দেহপটের সঙ্গে সঙ্গে আমি তো হারিয়ে যাবোই।

নাট্যশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত চর্চিত আর দু-একটি মাধ্যমের কথাও এখানে বলা যেতে পারে। ৪২-এর মন্বন্তর সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র কাজের পাশাপাশি তখনকার কয়েকজন চিত্রকরকেও অভিভক্ত কমিমউনিস্ট পার্টি গ্রামের নিরন্ন মানুষদের যন্ত্রণার প্রতিলিপি আঁকতে পাঠিয়েছিলেন। সেই শিল্পীরা এঁকেছিলেন সেই সময়কার ছবি, তৈরি করেছিলেন ভাস্কর্য। নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে ওইসব নিদর্শনের নানা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ওই কাজ, ওই সংযোগ কীভাবে ওই শিল্পীদের কাজকে, তাঁদের জীবনকে, জীবন দেখাকে প্রভাবিত করেছিল, সে আজ ইতিহাস। সে তো কেবল সেই সময়কার ছবিতে নয়, তাঁদের জবানীতে, ডায়েরিতে উল্লেখিত! কয়লাখনি অঞ্চলে চার্চের কাজ নিয়ে চলে যাওয়া ভ্যান গ্যঁগ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই চারপাশের জীবন দেখে, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছবিতে, ভাইথিওকে লেখা তাঁর চিঠিতে সে সব তো সম্পদ আমাদের। আমরা ক'জন সচেতনভাবে সেই দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই! এমনকী, জন মিল্টন এর অ্যারিওপ্যাগটিকা গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক লেখেন যে, জীবনের যে অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, মানব - চরিত্র বিষয়ে যে বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রজ্ঞা মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা - নিরাশা, উত্থান-পতনের পশ্চাতে রহিয়াছে যে-সকল গভীর প্রশ্ন—এই সকল বিষয়ে বাস্তব জীবনে দীর্ঘ দিনের বিষামৃতময় সত্যানুভূতি ব্যতিত, বিশেষ জাতির মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে - নিবদ্ধ সমস্যাগুলিকে চিরন্তন মানবের শুভাশুভের আলোকে গ্রহণ করিবার অনুশীলন ব্যতীত 'প্যারাডাইজ্ লস্ট' এবং 'প্যারাডাইজ রিগেইণ্ড' -এর মত মহাকাব্য এবং 'স্যামসন্ অ্যাগোনিস্ট' -এর মত নাটক হওত রচিত নাও হইতে পারিত। — যদিও এই দীর্ঘ বাক্যে অনুবাদক একটি হয়ত যোগ করেছেন তবু এই সিদ্ধান্ত যে স্বতঃসিদ্ধ, এ বিশ্বজনীন সত্য। বাস্তবের কাছাকাছি এসে মানুষকে মানুষের অস্তিত্বের কথা জানান দিতে গিয়ে যে কবির কাব্যভাষা, নাটককারের নাট্যগঠন, চিত্রকরের রঙরেখার অন্তর্বস্তু পাল্টে পাল্টে যায় এ তো পৃথিবীর ইতিহাস। চাওয়া শুধু ওই সবার চলার সুরে আমার কথাকে মেলাতে হবে। ঠিক যখনই রবীন্দ্রনাথ অর্থসংগ্রহের জন্য নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে মানুষের দরবারে গেছেন, পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যনাট্যের, বদল ঘটিয়েছেন তাঁর নাট্যভাষার পাবলিক স্টেজে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে গিয়ে।

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'বিনুর বই'-তে লেখেন, —রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি যাকে বলছি, আমাদেরও সেটা ট্র্যাজেডি, কেন না যে সমাজে আমাদের কাব্যকলার প্রচার, সে সমাজ আমাদের নয়। আর যে সমাজে আমাদের প্রকৃত স্থান, সে সমাজে আমাদের হুঁকো বন্ধ। আমরা কারিকর কিন্তু অন্যান্য কারিকরদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। সেইজন্য যারা অন্যান্য কারিকরদের ঘিরে দাঁড়ায় তারা আমাদের ছায়া মাড়ায় না। কাশীদাসী মহাভারত ঘরে ঘরে, আলাওলের পুঁথি অন্তত একটি জেলার গ্রামে গ্রামে চণ্ডীদাসের পদ মুখে মুখে, রামপ্রসাদী গান যেখানে সেখানে। দেশ শিক্ষিত হলে রবীন্দ্রনাথেরও দিন আসবে, কিন্তু ভয় হয়, শিক্ষার সম্যক বিস্তার সম্প্রতি হবে না, হলেও তা ভদ্রশিক্ষা হবে। ভদ্রশিক্ষা শিল্পের শত্রু। রসবোধের বৈরী। দেশশুদ্ধ লোক যদি ভদ্রলোক হয় তবে ছবির চোখ, গানের কান, গঠনের হাত, নৃত্যের চরণ দেশ ছাড়া হবে। —এই সময়েই লেখা অন্য একটি প্রবন্ধের উপসংহারেও এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম। সুপণ্ডিত অন্নদাশঙ্কর যেমন সমাজ নির্দিষ্ট শিক্ষা এবং প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদরেখা টানতে পেরেছিলেন, আমরা তেমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রথমেই নিজেদের ঐতিহ্য- উৎসকে অস্বীকার করি। এবং সেটাই হয়ে ওঠে আমাদের আধুনিক প্রাগ্রসরতার মার্কা। আজকের শিল্প আজকের সাহিত্য এখনকার গরিষ্ঠজনদের কাছে আদরণীয় মানেই হচ্ছে সেটি যথার্থ সৃষ্টি নয়— বহু প্রাজ্ঞজনেদের কাছ থেকেও এমন কথা বিভিন্ন সময় শোনা গেছে, শোনা যায়। অথ এর মাঝে মাঝেই এমন বহু উচ্চারণ আছে যা আমাদের দিকনির্দেশিকা হয়ে রয়ে যায়। ১৯৭০ -এর বহুরূপী নাট্যপত্রে (৩৪ সংখ্যায়) মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লেখেন, —খুব বেশীরভাগ লোককে যদি জনসাধারণ বলি, তবে থিয়েটারের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ, এক কথায় নেই। থিয়েটার ভদ্র সাধারণের।... বাংলার বুকের উপর যখন দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডব, তখন থিয়েটার ভালো চলা উচিত ছিল না। চলেছে সেই শ্রেণীর জন্য, যে শ্রেণীর পক্ষে দেশের এ দুর্দৈব নির্জলা দুর্দৈব নয়। যে শ্রেণী দেশব্যাপী দুর্দৈবের প্রতি চোখ বুঁজে থাকতে চায় আর থাকতে পারে।... নিষ্ফলা গাছে যেমন ফুল ধরতে পারে, ফল ধরে না, বাংলা থিয়েটারের সৃষ্টি এ পর্যন্ত তেমনি শুধু ফুল। ফুল যত সুন্দরই হোক, ফল রেখে যেতে না পারলে জীবনধারার সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র ফলের বীজের সূত্রেই জীবধাত্রী ধরিত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ফুল মরণকে অগ্রাহ্য করে

যাচ্ছে। থিয়েটারও যতক্ষণ পর্যন্ত মাটির সঙ্গে, মাটির মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে করে প্রকৃত গণনাট্য হয়ে উঠতে না পারবে, ততক্ষণ বারে বারে তার জীবনসঙ্কট উপস্থি হবেই।

আমরা গণনাট্য-র দর্শনকে 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে' নস্যাৎ করতে পারি, প্রাতিষ্ঠানিক ভদ্র শিক্ষাকে একমাত্র বিবেচনায় গরিষ্ঠ অ-শিক্ষিত জনেদের থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, নিজদের সৃষ্টিকে মুষ্টিমেয়র করতালি আর প্রশংসা পুরস্কারের সার্থক কালজয়ী বলে শ্লাঘা অনুভব করতে পারি কিন্তু প্রকৃতই তা উত্তরাধিকারের বীজ বহন করছে কিনা, নিস্পৃহভাবে সেই বিচারের কী হবে!

বর্তমান সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র তখন তার নীতি নিয়ম মেনে সব রকম হিসেব নিকেশ-এর পর তার স্বীকৃতি সম্মান ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয় কোনো একজন স্রষ্টার চৌকাঠে, তখন অনস্বীকার্য, সেই স্রষ্টার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু কখন সেই একের পর এক সম্মান মালিকা উঁচু হতে হতে স্রষ্টার দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপে আটকে ফেলেছে, এটা না বুঝতে পারলেই সমস্যা প্রবল। নিজের পরিবেশিত তথ্যকেই একমাত্র বলে মেনে নিলে, নিজের অর্জিত জ্ঞানই শেষ কথা— এই তৃপ্তিতে স্থানু হয়ে যে নির্মাণ কার্য চলে, তা ওইরকম স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন কিছু মানুষের বাহবা পেতে পারে! পাবেই, কারণ তখন আমরা কয়েকজনই তো আমরা। আমাদের লাফিয়ে ওঠাতেই তো পৃথিবীর গণ্ডী শেষ। কিন্তু নাট্যে ওই যে প্রতিদিন অঙ্গন-পূর্ণ দর্শকের প্রতীক্ষা, তাঁরা আসবেন কোথা থেকে। কোন ভাষা শুনতে। নাট্যমাধ্যমের বৈশিষ্ট্যই বলুন আর নির্দিষ্টতাই বহুল, তাকে অবশ্যই বহুর কাছে যেতেই হবে। ফলে শুধু আপনার উচ্চতর (!) চিন্তা আর উৎকৃষ্ট (!) নির্মাণ পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়, নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙতে গড়তে যেতে হবে তাঁদের কাছেই। যে হাটে আপনি আপনার পশরা সাজিয়ে বসবেন সেই হাটের ক্রেতাদের অবস্থান, সামর্থ এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে আপনাকে জানতেই হবে। আর সেই চেষ্টায় গেলে পরেই আপনি দেখতে পাবেন আপনার চাওয়া বা কনসেপ্ট্ (সিগনিফায়েড) কেমন নতুন নতুন সাইন ভেহিকল্ (সিগনিফায়ার)-এর জন্য পাগলের মতো ছটফট করছে। সেই উপলব্ধিই আপনার নান্দনিক শ্রম। আর এই অভিজ্ঞতার ফসল সঞ্চয় করতে, ক্রমাগত প্রকাশ-পদ্ধতির বদল ঘটাতে ঘটাতে আপনি একসময় দেখতে পাবেন, থিয়েটার যে মাইরিটি কালচার সেই তত্ত্বের প্রবক্তা - বন্ধুদের আপনি বহুদূরে ফেলে চলে এসেছেন। আর তখন আপনার চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। আপনার নতুন প্রকৃত বন্ধুর দল।

তথ্যসূত্র

- দ্য সেমিওটিকস্ অব্ থিয়েটার অ্যান্ড ড্রামা, কেইর এলাম (Keir Elam), রুটলেজ, ২০০১।
- অ্যারিওপ্যাগিটিকা : জন মিল্টন, (অনুবাদ : শশীভূষণ দাশগুপ্ত) সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৪।
- সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ:সুবিমল মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪১৪।
- বঙ্গদর্শন, সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী, ৬ ও ৭ যুগ্মসংখ্যা, বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০০৫।
- সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, অখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নয়া উদ্যোগ, কোলকাতা, ১৯৯৭।
- ওপেনটি বায়স্কোপ, শোভন সোম, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৩।
- রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।
- ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এল ইত্যাদি বিতর্ক : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অনুষ্টুপ, ২০১০।